ভয়েস মার্ক

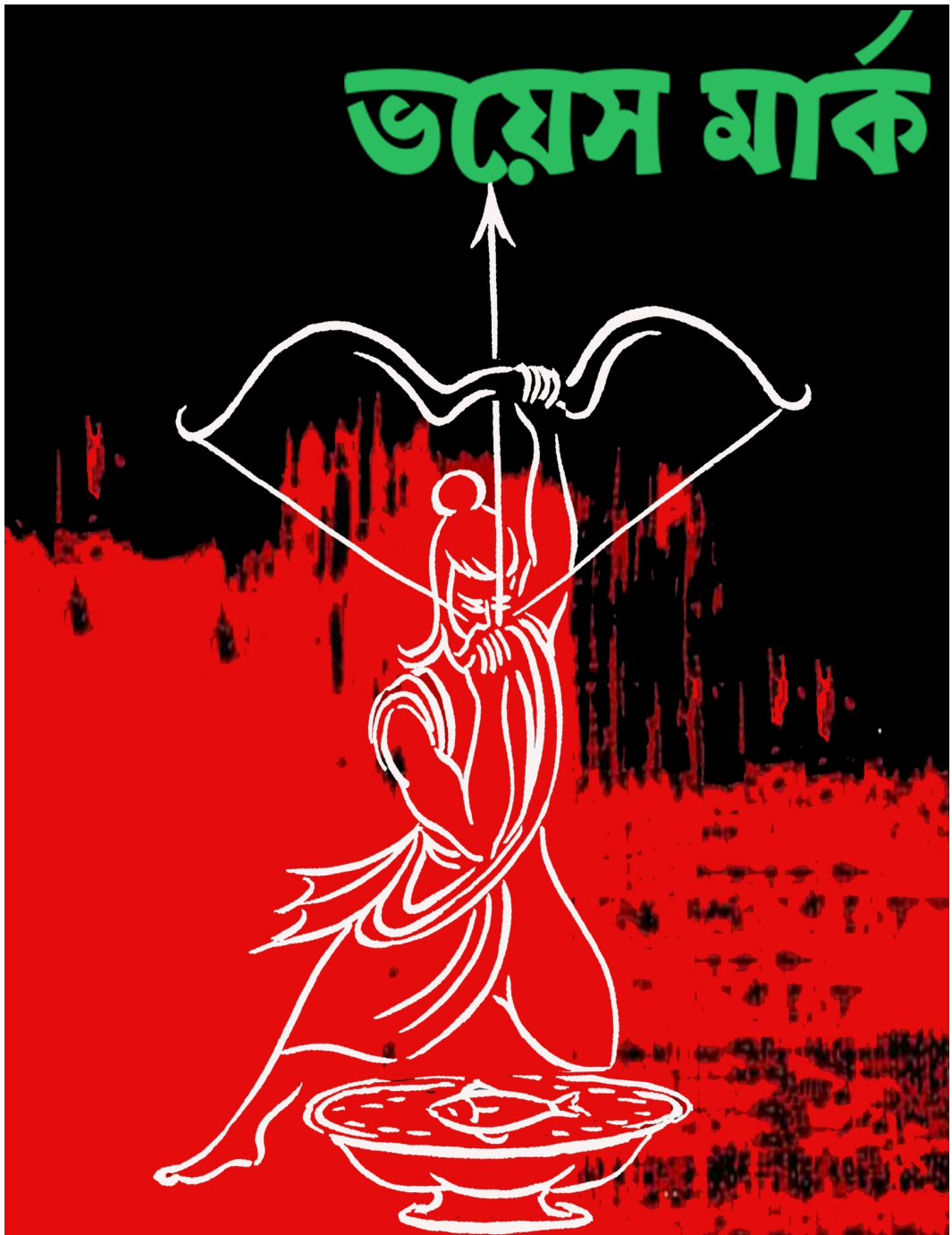

তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। মে - জুন ২০২১। ৩০ টাকা

ভয়েস মার্ক

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক
মোঃ আযাদ হোসেন

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩০ টাকা (বিশেষ সংখ্যা বাদে)
গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫০ টাকা। যে কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
গ্রাহক পরিষেবায় যোগাযোগ : রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

পত্রিকার যোগাযোগ স্থান

বহরমপুর : ৯৯৩২৮৩৭১৮৫ / ৩৫৮৭৪৩৮৪৯৭
বর্ধমান : ৮১১৬২৭৯১৫২
বাঁকুড়া : ৯৩৭৮৪৮০১৯২
দ: ২৪ পরগণা : ৮৯২৬৭৪৪১৪০
উত্তরবঙ্গ : ৯৪৩৪৬৫৫৬১০

যোগাযোগ

ভগবানপুর, আষাঢ়িয়াদহ
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮.
E-mail: voicemark19@gmail.com
Mob: 9932837185 / 9735874384
Web: www.voicemark.in

ভয়েস মার্ক

তৃতীয় বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা। মে-জুন ২০২১। ৩০ টাকা

সম্পাদক
মোঃ আযাদ হোসেন
Web: www.voicemark.in
voicemark19@gmail.com
WhatsApp : 9932837185
azadm.1981@gmail.com
Mob. ৯৭৩৫৮৭৪৩৮৪

গ্রাহক পরিষেবা: রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

প্রচ্ছদঃ হিমাদ্রী শেখর মজুমদার

মূল্য : ত্রিশ টাকা

মোঃ আযাদ হোসেন কর্তৃক ভগবানপুর, আষাঢ়িয়াদহ, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক কিস অফসেট প্রেস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ৭৪২১০১ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়
জনবাদ বনাম অধিকার ৩

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ
নারীর বহুবিবাহ ৪
ভারতে ধর্ম ৮
পশ্চিম বঙ্গের বিধান সভা নির্বাচন ২০২১ ১০
বাম রাজনীতি ও বিধান সভা নির্বাচন ২০২১ ১৩
নির্বাচনী ইশ্যু প্রাদেশিক না কেন্দ্রীয় ১৬
নির্বাচন ও শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ১৭

প্রবন্ধ
বাঙালির বিস্মৃত ধান্য-সংস্কৃতি ১৯
ড. দেবল দেব
আমিত্ব সংগ্রাম ২৩
কিংশুক সন্ন্যাসী
বস্তু নিরিখে সামাজিক ও অসামাজিক ২৫
আযাদ রহমান
শ্রীপঞ্চমী তত্ত্ব ২৮
শ্রীচেতনিক

গল্প
মৃন্ময়ী ৩০
কস্তুরী
কালপুরুষ ৩১
বৈশালী রায়চৌধুরি
শোকেস ৩২
সেলিনা খাতুন
রুস্তম ৩৪
আব্দুল মোমিন

কবিতা
গুচ্ছ কবিতা ৩৫
রঞ্জন পাড়ুই

পুনঃপাঠ
রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত ৪৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

‘অস্তিত্ব’ প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

১। অস্তিত্বঃ প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ)	১৫০.০০
২। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ এক	২০০.০০
৩। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ দুই	২০০.০০
৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং ...	১৩০.০০
৫। জীবন দিশারী ‘অস্তিত্ব’	৩০.০০
৬। মেধা প্রতিভা কি ভাগ্য (!) বাচক? কী তার লভ্য প্রযুক্তি?	১৫০.০০
৭। দাম্পত্য প্রযৌক্তিক পরিবার সমিতি	৩০.০০
৮। বস্তু প্রযুক্তি নির্মাণী ‘অস্তিত্ব’	২৫.০০
৯। সত্তার অর্গল ভাঙাটাই মনের দরজা খোলার রহস্য	৪০.০০
১০। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ	১০০.০০

‘অস্তিত্ব’ প্রকাশেয় গ্রন্থাবলি

১। পূর্বপ্রসঙ্গ	১৬টি কলম
২। সৃষ্টিতত্ত্ব	২২টি কলম
৩। জীবনতত্ত্ব	৪৮টি কলম
৪। দেহতত্ত্ব	৮টি কলম
৫। জীবতত্ত্ব	১টি কলম
৬। ঋজুতত্ত্ব	৭৪০টি কলম
৭। সরেজমিন বা স্পটলাইট	একটি সিরিজ
৮। একসোডাস কল্লোল (কবিতা)	একটি সিরিজ
৯। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্ত পূর্ব এবং ...	একটি সিরিজ

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)
যোগাযোগ: ৯৮৩০০৬৯৫২৫
E-mail: emdadul197@gmail.com

সম্পাদকীয়

জনবাদ বনাম অধিকার রাজনীতি

ডোল রাজনীতির চিকন নাম অধুনা দাঁড়িয়েছে জনবাদ শব্দবন্ধের সন্দর্ভে। শুধুই কি নাম পরিবর্তিত হয়েছে? না, শুধু নাম পালটায় নি। ক্ষমতা-কর্তৃত্ব মানুষের অধিকারের পরোক্ষ স্বীকৃতি অধিকার নামাঙ্কন ছাড়াই দিতে বাধ্য হয়েছে।

প্রশ্ন হল রাজনৈতিক দলগুলো যারা ক্ষমতার ম্যান্ডেট পায় বা পেতে ইচ্ছুক হয়ে রাজনীতিতে অংশ নেয় তারা সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণে নাগরিক অধিকার কথাটিকে এত ভয় পায় কেন? এই ভয় থেকেই জনমনে পাইয়ে দেওয়া এবং ফাউ পেয়ে যাওয়ার ধারণার সংক্রমণ ঘটে। ভয়ের কারণ সঙ্গত। নাগরিক ঔচিত্য বা নাগরিক অধিকার বোধ সঞ্চারিত হয়ে গেলে ক্ষমতার সমস্যা। ভারী সমস্যা। কারণ সেই অধিকার চেতনার কাছে তার কোনো বড়পনাই কাজে আসে না। আমি বা আমরা এইটা দিয়েছি বলবারও কোনো উপায় থাকে না। শাসক দলের পুনরায় নির্বাচিত হবারও কোনো গ্যারান্টি তাতে থাকে না।

শুধু তাই নয়। অধিকারের স্বীকৃতি বা অধিকার রাজনীতির প্রবক্তা হতে গেলে তার আদর্শ থাকতে হয়। সেই আদর্শ অনুযায়ী আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও তার রূপায়ণ করতে হয়। যাতে সচেতন ভাবেই নাগরিক ঔচিত্যবোধ, নাগরিক মূল্যবোধ বা রাজনৈতিক বোধ এবং মূল্যের বিনিময় সচেতনা অর্থাৎ সামাজিক বোধ বিকাশের ব্যবস্থাপনা নিতে হয়। স্বাধীনোত্তর ভারতে অদ্যাবধি জাতীয় কংগ্রেস, বাম দল বা অন্য কোনও আঞ্চলিক দল এই আদর্শভিত্তিক দল গঠন করেনি বা তার সামাজিক-রাজনৈতিক অনুশীলন করেনি।

বাম দলগুলো ছাড়া বাকিরা এক্ষেত্রে সমরূপ এজেন্ডায় পথ চলেছে। মানে অধিকার রাজনীতির পাশ কাটিয়ে তারা জনবাদী রাজনীতির দিকেই গেছে। বামেরা? এরাও জনবাদী রাজনীতিই করেছে। সঙ্গে বাড়তি আরেকটি কাজ করেছে যেটিকে সমাজ পরিসরে 'মুখে চুকা' বলা হয়ে থাকে। মানে অধিকারের কথাটিকে স্লোগানে ও মুখের কথায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার করে বলা কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঐ জনবাদ বা ডোল রাজনীতিকেই আঁকড়ে ধরা। এর উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গে তিন দশকের বাম শাসন। তাদের গৃহীত সামাজিক সাংস্কৃতিক পদক্ষেপগুলি। অর্থাৎ এরা আদর্শ (কম্যুনিজম) বাস্তবায়নে কোনোই কর্মসূচি নেয়নি, উলটে মুখে মারিতং জগৎ করে অধিকারের বক্তব্যটিকেই জনতার কাছে খেলো করে দিয়েছে। এইটা এদের ক্ষেত্রে বাড়তি।

রাজ্যের বর্তমান শাসক দল বামেদের স্লোগানের গরিব -মেহনতি-খেটে খাওয়া-শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র ইত্যাদি বর্গের মানুষকে নানান জনবাদী প্রকল্পে তার সমর্থন বৃত্তে টেনে এনেছে। তিন টার্মের তাদের সরকার চলছে। মধ্যবিত্ত সরকারি চাকুরি প্রত্যাশী অংশ বাদে উল্লেখিত অপরাপর বর্গ তৃণমূলের এই জনবাদকে ব্যাপক সমর্থন দিচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

অধিকার রাজনীতির কাছে বর্তমান শাসকের জনবাদ ধারে ও ভারে বৃহৎ। কারণ ২০১১-২০২১ পর্বে রাজ্যের বাজেট তথা অর্থনীতির আয়তন বেড়েছে। তার সাযুজ্যে জনবাদী প্রকল্প গুণ ও পরিমাণে ক্রমশ বাড়ছে। এটি যতই কলেবরে বাড়বে অধিকার রাজনীতির নতুন সন্দর্ভ নির্মাণ ততটাই কি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে?

তা নির্ভর করছে অধিকার রাজনীতির প্রবক্তার দ্বান্দ্বিক ডায়নামিজমের উপর। যা আলটিমেটলি জনবাদের দেওয়া-থুয়ার বিপরীতে ব্যাপক জনতাকে অধিকার রাজনীতির অঙ্গনে খাড়া করবে।

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

নারীর বহুবিবাহের (Polyandry) প্রস্তাব!

গ্রিন পেপার প্রস্তাব

দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সম্প্রতি নারীর বহুবিবাহ প্রথা চালু করার সুপারিশ করেছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র দপ্তর গ্রিন পেপার প্রকাশ করে এই প্রস্তাব করেছে। দেশটিতে এ নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। (বিবিসি, ২৯ জুন, ২০২১)। নারীবাদীরা উদবাহু হয়ে এর সমর্থন করেছে। সবকটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ধ্বজাধারীরা এর বিরোধিতা করেছে। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রসঙ্গে কী বলে অর্থাৎ এ নিয়ে আমরা বস্তুবাদীরা কী দৃষ্টিকোণ গঠন করব?

আফ্রিকা মহাদেশের কেনিয়া জিম্বাবোয়ে প্রভৃতি দেশে এখনও সামাজিক স্বীকৃতির আড়ালে নারীর বহুবিবাহ (Polyandry) চালু আছে। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তেই হয়তো কমবেশি বিষয়টি দেখা যাবে। যেমন বহুগামী (Polygamic) নারী যারা বিবাহ করেছেন কিন্তু বহুপুরুষের সাথে যৌন-যাপন করেন তাদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তো তাই-ই। আবার তসলিমা নাসরিনের মত নারীর ক্ষেত্রে যারা বিবাহ ব্যাপারটি মানেন না তারা লিভ ইন করেন। কিন্তু একসাথে একপুরুষের সাথেই করেন। বহু পুরুষ নিয়ে লিভ ইন করেন না। এটাও মনে রাখা দরকার।

আলোচনায় যাবার আগে উল্লেখ্য যে দেশটির বিবাহ ব্যবস্থাপনা তিনটি আইনের দ্বারা সংঘটিত হয়। ১। The Marriage act of 1961 —এই আইন সামাজিক ও ধর্মীয় বিবাহকে স্বীকৃতি দেয়। ২। The Recognition of Customary Marriage Act 1998 —আফ্রিকার সামাজিক নানান কাস্টমারি বা রীতি-প্রথা মূলক বিবাহকে স্বীকৃতি দেবার আইন এটি। ৩। The Civil Union Act, 2006 —এই আইনে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সিভিল বা ধর্মীয় বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই আইনের দ্বারা সমকামী বিবাহ দেশটিতে স্বীকৃতি পায়।

আর্থসামাজিক অবস্থা

১. দেশটিতে বেকারত্বের হার ২৫ শতাংশ। ২. দেশের ৭০ শতাংশ সম্পদ ২০ শতাংশ লোকের হাতে কুক্ষিগত। ৩. প্রতি ১০টি পরিবারের ৯টির স্বাস্থ্য বিমা নেই। ৪. যোগ্যতা সম্পন্ন কালো মেয়েরা সাদাদের তুলনায় কম বেতন পায়। ৫. দেশের ক্ষমতা বর্ণবাদী শাসনামলে তৈরি হওয়া কোম্পানগুলির হাতে। ৬. বিশ্বব্যাঙ্ক দেশটিকে অর্থনীতিগতভাবে সবচেয়ে বৈষম্যপূর্ণ দেশ ঘোষণা করেছে ৭. দেশটির আর্থিক বৃদ্ধির হারও শোচনীয় ।

তথ্যগুলির সোর্স- ১। অক্সফ্যাম সাউথ আফ্রিকান রিপোর্ট ২০১২। ২। বিশ্বব্যাঙ্ক এর সমীক্ষা ৩। উইকিপিডিয়া

উল্লিখিত তথ্যগুলির বিশ্লেষণে কী পাওয়া যাচ্ছে ? প্রতিপদে মানুষের অধিকার ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে দেশটিতে। সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করাটাই সেখানে অগ্রাধিকার। সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কর্পোরেট শ্রেণি বনাম জনতা দ্বন্দ্ব জাগিয়েই করতে হয়। জাগানোর প্রয়াস মানেই সাংস্কৃতিক আমিত্ব কর্ষণ। তাতেই পরিষ্কার হয় শত্রু মিত্র। তার মেরুকরণে দলগঠন হয়। আর্থসমাজ দ্বন্দ্ব থেক উঠে আসা নেতৃত্ব সেই দলের পরিচালনায় এসে গেলে ঘটে যেতেও পারে অধিকার প্রতিষ্ঠা! আর তাতে অগ্রাধিকার পায় ক) বেকারি দূরীকরণ খ) আর্থিক বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ গ) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি ঘ) বর্ণবাদী বৈষম্যের অবশেষকে ছেঁটে ফেলা। ঙ) নারীর ক্ষমতায়ন চ) সার্বিক জীবন ছন্দের স্বীকৃতি ইত্যাদি প্রভৃতি।

নারীবাদী চক্রান্ত

কী ভয়ানক ব্যাপার, এ্যা! হ্যাঁ ভয়ানক ব্যাপার তো বটেই। উল্লিখিত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়গুলি কাদের

জন্য? নিশ্চয় আফ্রিকান নাগরিক নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য। কর্পোরেট প্রভু প্রমাদ গোনে।

৭০ শতাংশ দেশবাসীর লাভ হলে কার ক্ষতি হয়? নিশ্চয় শাসক কর্পোরেটের। তাহলে শাসক কর্পোরেটের ত্রাতা কী হতে পারে? নিশ্চয় তা এমন কিছু যার সাথে সেই জাজ্বল্যমান আর্থসামাজিক অবস্থার কোনো লিংক নেই। সেই লিংকলেস হযবরল হল এই পলিয়ান্ড্রি প্রস্তাব! নারীবাদী ফন্দি! তাকে ফন্দি করতে হয়। এমন ফন্দি যাতে অধিকার বঞ্চিত নর-নারীর মধ্যে বিবাদ লাগে। ব্যাস কেল্লা ফতে!

নারীর বহুবিবাহ প্রস্তাব সেই কেল্লাফতের হাতিয়ার। যা রক্ষণকামিতার সহচর নারীবাদকে দিয়ে সে আগেভাগেই তুলিয়েছে। তারপর নিজে তার প্রস্তাব করেছে গ্রিন পেপার প্রকাশ করে! এইটুকুতে কোনো সমস্যা নেই। ঝকঝকে পরিষ্কার। তাই না? কিন্তু তাতেই কি নারীবাদী চক্রের নারীর বহুবিবাহ (পলিয়ান্ড্রি) দাবিটি মরে যায়? মরে না। তাই আরো একটু আলোচনা প্রয়োজন।

বিবাহ ব্যবস্থার বিবর্তন

মানব সমাজে বিবাহ ব্যবস্থাপনা সুদীর্ঘ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান একপতিপত্নী ব্যবস্থায় এসেছে। তার সুদীর্ঘ পিরিয়ডের নানান ওঠা পড়া আছে। তা একমুখীন নয়। এই বিবর্তনকে গবেষকরা তাঁদের গবেষণায় From Savagery through Barbarism to Civilization দিকে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক গতি বলেই দেখেছেন।

আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ হেনরি ল্যুইস মর্গান(১৮১৮-১৮৮১) তাঁর 'প্রাচীন সমাজ' (১৮৭৭) গ্রন্থে এই বিবর্তনের বিস্তৃত বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) তাঁর 'The Origin of Family, Private Property and the State' (১৮৮৪) গ্রন্থে মর্গানকে উদ্ধৃত করেছেন এবং বিবাহ ব্যবস্থাপনার এই পরিবর্তনকে (সিফটিং) সম্পত্তি সম্পর্কের জটিল আর্থসামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিকটি সহ বিশ্লেষণ করেছেন। এবং বিবাহ ব্যবস্থার এই একপতিপত্নী সম্পর্টিকে ইতিবাচক অগ্রগতি বলেই দেখিয়েছেন। কিন্তু সেই অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হল পুঁজি -কেন্দ্রিক মালিকানা ব্যবস্থাপনা। এই মালিকানা ব্যবস্থাটিকে নষ্ট করে সামাজিক মালিকানার আর্থসামাজিক শ্রমসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে যৌন-প্রেমের একপতিপত্নী সম্পর্কটি তার কাঙ্খিত তাৎপর্য অর্জন করতে পারে। নারীর অবদমনের দিকটি থেকে নারীরও মুক্তি ঘটতে পারে। পুরুষের আধিপত্য ও বিবাহ বন্ধনের অচ্ছেদ্যতার কারণ রূপ এই মালিকানা সম্পর্কটি বিনষ্ট হলেই তা সম্ভব। পরবর্তীতে প্রেমের ভিত্তির উপর এই সম্পর্ক টেকা বা না টেকা নির্ভর করবে।

জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অগাস্ট বেবেল (১৮৪০-১৯১৩) তাঁর গ্রন্থ 'Women in the Past, Present and Future' (1897) বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

তাদের থেকে কী পাওয়া গেছে? আর্থসামাজিক মালিকানা সম্পর্কের রূপান্তর এক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়েছে। ভূমিদাস-সামন্ত হয়ে পুঁজি ভিত্তিক উৎপাদন কাঠামোয় নারীকেন্দ্রিক কৌম সমাজে যৌন সম্পর্কের বিষয়টি নারীর বহুবিবাহ ব্যবস্থা থেকেই একপতিপত্নী ব্যবস্থায় সিফট করেছে। হুট করে পুরুষরা তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং অথবা দাবড়ানি বা পুরুষতন্ত্র নারীর উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের যৌন স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে ব্যাপারটি আদৌ এরকম নয়। নারীবাদী একচোখাদের লেখাপত্র দেখলে সেটিই মনে হবে। কিন্তু নারী বন্দি হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। কারণ একপতিপত্নী ব্যবস্থাপনাটি পুরুষের দিক থেকে বাধ্যতামূলক থাকেনি। থেকেছে নারীর দিক থেকে। যাতে করে গণিকাবৃত্তির আর্থসামাজিক ভিত্তিটিও পাকাপোক্ত হয়েছে। রক্ষণকামিতা অর্থাৎ শাসক শ্রেণি নারীকে দাবিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ করেছে, ডমিনেট করেছে। এই করাটা বন্ধ করতে হবে। সেই বন্ধ করার বাস্তব ভিত্তি কীসের উপর গড়ে উঠবে?

১৯১৭ এর মহান নভেম্বর বিপ্লব। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সোভিয়েত থেকে গণিকাবৃত্তি অবলুপ্ত হল। নারী তার শ্রম-বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেল। প্রেম ভিত্তিক

দাম্পত্য সম্পর্কের ইতিহাস গড়ে উঠল। মহান কর্মযজ্ঞ শুরু হল। পারিবারিক শ্রম আর্থসামাজিক শ্রমে রূপান্তরের লেনিনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হবার আগেই তাঁর দেহান্ত হল। এরপরের ইতিহাস সকলেরই জানা। রক্ষণকামী আগ্রাসনের এক পর্যায়ে ক্রেমলিন থেকে লালপতাকা নেমে গেল। গণিকাবৃত্তি বহাল তবিয়ত হল। ইতিহাসকে উলটো দিকে নিয়ে যাওয়া হল। তারপরেই তো রক্ষণকামিতার প্রতিনিধি ঘোষণা করল ডেথ অব হিস্ট্রি! নারী আবার বন্দি হল!

অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানাধীন শ্রমসম্পর্কের আর্থসামাজিক বনিয়াদ নারীকে বন্দি করে। শুধু নারীকে না। পুরুষকেও করে। তা থেকে তাদের বন্দিত্ব ঘুঁচতে পারে সেই মালিকানা সম্পর্কের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে। সোভিয়েতে যা বাস্তবায়িত হয়েছিল।

একগামিতা না বহুগামিতা?- 'অস্তিত্ব' নিরিখ

নর-নারী সত্তাগতভাবেই বহুগামী। এই বহুগামিক নেচার কি বিকৃত? বিকৃত কিনা তা না বলে সহজ করে বলা যায় তা নিয়মানুগ নয়। কীসের নিয়মানুগ নয়? মহাবিশ্বপ্রকৃতি যে নিয়মে নিয়মানুগ সেই নিয়মে। অর্থাৎ মহাবিশ্বপ্রকৃতির ধর্ম (Universal Law) হল চেতনিক একত্ব-লক্ষ্য। মানুষকেও সেই লক্ষ্যে তার বহুগামিতাকে লাগাম দিতে হয়। নিজ সত্তায় আবদ্ধ আমিত্বকে মুক্ত করতে হলে এইরকম অসংখ্য অনিয়মকে আয়ত্ব করেই তাকে সত্তার দরজা খুলে বাইরে আসতে হয়। অর্থাৎ তা করা যায় সংগ্রামের মাধ্যমেই। এই সংগ্রাম আপনাতে আপনি ভোগের জন্য অর্থাৎ সেল্ফ প্লিজ্যান্ট এনজয়িং এর জন্য। যা সংস্কৃতি। অর্থাৎ এই সংস্কৃতিরূপ সংগ্রামেই নিহিত আমিত্ব প্রেমের বিকাশ যা পরশ বাচক দাম্পত্য প্রযুক্তির হাতিয়ারে রক্ষণকামী শত্রুকে চিহ্নিত করে। নর-নারীর মিলিত মুষ্ঠিবদ্ধ হাত রক্ষণকামকে ছেড়ে দেয়না। তার বিরুদ্ধে জন্ম দেয় ও লালন করে আর্থসমাজের পাণ্ডবকে। কুরুক্ষেত্রের লড়াইতে রক্ষণকামী অপশক্তি পরাজিত হয়। আর্থসমাজ পায় দ্রৌপদী রূপ অগ্রসরমানতা যা সেই আর্থসমাজই ভোগ করে।

'অস্তিত্ব' এর দাম্পত্য ও জাকাত প্রযুক্তি

সোভিয়েত উত্তর দুনিয়ায় আর্থসামাজিক মূল্য ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিমালিকানা নির্ভর। এই ভিত্তির উপর অন্যবিধ যাবতীয় সম্পর্কগুলি দাঁড়িয়ে আছে। একপতিপত্নীর যৌন-প্রেম বাচক দাম্পত্য সম্পর্ক এখানে একের শ্রমে অন্যের ভাগবসানো বা একের উপর অন্যের বোঝা চাপানো দাম্পত্য। যাতে নারী তার যৌনতার বিনিময়ে আর্থসামাজিক নিরাপত্তা চায়। পুরুষ যৌনতার জন্য তা দিতে বাধ্য। দাম্পত্য তাহলে কীসের ভিত্তিতে ? নিতান্ত বিনিময়। প্রেম সেখানে কোনো মূল্যই ধরে না! ইহাই রাসেল কথিত আইনি বেশ্যাবৃত্তি! তো এইখান থেকে উত্তরণ কীসে?

এক পতিপত্নী ভিত্তিক যৌন-প্রেমের কথা মার্ক্সবাদও বলে। তথাকথিত পুঁজির প্রবক্তারা তো বলেনই। তবে 'পুঁজি'র প্রবক্তাদের সাথে বস্তুবিজ্ঞান অর্থাৎ 'অস্তিত্ব' এর বলার পার্থক্য আছে। তারা যখন এক পতিপত্নীর বিবাহ ব্যবস্থার কথা বলেন তখন তাতে 'পবিত্রতা' কথাটি প্রাতিষ্ঠানিক তক্তি হিসেবে জুড়ে দেন। বস্তুবিজ্ঞান তা করে না। বস্তুবিজ্ঞান বলে দাম্পত্যকে পবিত্র করে নিতে হয় পরশবাচক আমিত্বযোগ্যতায় যা আর্থসামাজিক দায়বদ্ধতারও পরিচয় দেয়।

মানে কী?

মানে হল, প্রাতিষ্ঠানিক তক্তি জুড়লেই দাম্পত্য পবিত্র হয় না। তাকে পবিত্র করতে হয়। কীভাবে? আমিত্ব প্রেমের চর্চায়। তা কীভাবে?

অতৈন্দ্রিক ধারণার মূলোচ্ছেদ ঘটিয়ে। সেটি কী? ব্যক্তিমালিকানা নির্ভর শ্রমসম্পর্কের আর্থসমাজে সব রকম ধারণার সংক্রমণ ঘটে মানুষের অতৈন্দ্রিক ধারণার আঁতুড় ঘর থেকে। 'অতৈন্দ্রিক ধারণা' মানে ইন্দ্রিয় অতিরিক্ত কোনো কিছু যা সমাজে 'অলৌকিক' বলেও পরিচিত। তাতে ঘুরপাক খাওয়া। সেই ধারণার মূলোচ্ছেদ করা যায় ইমান অর্থাৎ বিশ্বাস সঞ্চারণ করে।

যা –

১. আমিত্ব চেতনার উপলব্ধি। অচেতন নয়, জেগে উঠতে হয়। জাগ্রত 'আমি' তার বিকাশ ঘটাতে চায়।

২. শ্রম প্রয়োগ করা। শ্রম প্রয়োগ করেই যে বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

৩. মূল্য উৎপাদন থেকে আবশ্যিক ও উদবৃত্তের বিভাজন ও উদবৃত্তের বিন্যাস সম্পর্কিত জ্ঞান যা অর্থনীতি। অর্থনীতির জ্ঞান অর্জন করা।

৪. অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের কৃৎকলা অর্থাৎ রাজনীতি। যার প্রয়োগেই ইতিহাস সৃষ্টি। সেই রাজনীতি সচেতনা গড়ে তোলা।

৫. আর্থসামাজিক সলাত কায়েম। যাতে ভোগ হয় নান্দনিক, চেতনা হয় বর্তমান।

আর এটি করতে পারলেই চেতনায় যা কিছু নিম্নতলী অর্থাৎ কামনাগত তার নিয়ন্ত্রণ সহজেই করা যায়। চেতনা আমিত্ব প্রেমবাচক বিকাশে নিজেকে ক্রমোন্নত করতে থাকে। তাতে দাম্পত্যের বাধা-রূপ ১. দাম্পত্য সঙ্গীকে সম্পত্তি মনে করা ২. কেবল টাকার পেছনে ছোটা ও ৩. যন্ত্রবৎ যৌনতা– থেকে নিজেকে মুক্ত করা যায়। দম্পতি তখন আর্থসমাজের অন্দরমহলে প্রবেশ করে শ্রমতত্ত্বাবধান বাচক সমাজ গঠনের পরিচালক নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে পারে। সেটি করতে পারে শ্রমতত্ত্বাবধায়ক রণনীতিতে। সেটি কী?

সেটি হল, আবশ্যিক মূল্যের বস্তুভোগের স্বীকৃতি পেতে উদবৃত্তের নিয়োজনী ত্যাগের যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে। অর্থাৎ আলকোরানিক ওয়াকিমুসসলাত আর ওয়াতিয়ুজ্জাকাত তত্ত্বের বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে। মানে জাকাত প্রযুক্তির বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

সাদামাটা কথায় তা হল দাম্পত্য সঙ্গী তার শ্রমে উপার্জিত মূল্যের উদবৃত্ত রূপ আর্থসামাজিক সম্পদকে আর্থসামাজিক ট্রাস্ট (বায়তুল ফান্ড) কর্তৃত্বে অর্পণ করে। যাতে তার আবশ্যিক মূল্যরূপী পুনরুৎপাদী ভোগ সার্থক হয়।

আর এসবেরই সফলতা নির্ভর করে দাম্পত্যের পরশ বাচকতার উপর। পরশহীনতা মানেই আগুনের ছ্যাঁকা। সেই ছ্যাঁকার দাম্পত্য যে মন্ত্রেই শুদ্ধ করা হোক তা শুদ্ধ নয়। তা বিষাক্ত।

বস্তুবিজ্ঞান বিষাক্ত দাম্পত্যের অবদমন চায় না। তা থেকে বেরোবার রাস্তাটাও সদরেই রাখে। মফস্বলি দরজার প্রয়োজন তাতে থাকেনা।

সে তো পরের কথা। অস্তিত্ব প্রস্তাবিত বিবাহ ব্যবস্থাপনা ম্যারেজ মেডিক্যাল বোর্ড এর প্রাতষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাতেই সম্পন্ন হয়। আর তা সঠিকভাবে সম্পাদিত হলে আর্থসমাজে বিষাক্ত দাম্পত্য সংক্রমণও ঠেকানো যায়।

কাজেই রক্ষণকামী শক্তি নারীর বহুবিবাহের আয়োজনে নারীকে মুক্তি দিতে চায়না। যেমন আজও নারী বন্দি। তাকে আরও বন্দি করতে চায়! সেই চাওয়াটা তার হাস্যকর অযৌক্তিকতায় প্রকাশও পাচ্ছে! আসলে নারী নয়! সম্পত্তি সম্পর্কের ধাঁ-ধাঁ সে কাউকেই জানান দিতে চায়না। তাই সেই দিকটিতে কারুর যাতে নজর না যায় সেটি নিশ্চিত করতেই এই অপকাণ্ডের ফন্দি সে আঁটছে!

ভারতে ধর্ম-ধারণার বর্তমান স্বরূপঃ একটি সমীক্ষা

পিউ রিসার্চ সেন্টার (Pew Research Centre) ভারতে 'ধর্ম' ও 'ধর্মীয়' মনোভাবের ওপর একটি সমীক্ষা চালিয়েছে সম্প্রতি। সমীক্ষায় ব্যবহৃত হয়েছে ৩০ হাজার স্যাম্পল। প্রত্যক্ষ কথোপকথনের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তারা রচনা করেছে। 17টি ভাষায় 30 হাজার প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সরাসরি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। 2019 সালের 17 নভেম্বর থেকে 2020 সালের 23 মার্চ (কোভিড মহামারির আগে পর্যন্ত) সমীক্ষাটি করা হয়। পিউ রিসার্চ সেন্টার নিউইয়র্কে অবস্থিত একটি চ্যারিটেবল সংস্থা। যার ফান্ডিং ও অন্যান্য সবকিছুর জন্য সংস্থাটি স্বাধীন। অন্য কোনো পক্ষ বা দাতা সংস্থার উপর নির্ভরশীল নয়। এই সমীক্ষার ফলাফল 'ভারতে ধর্ম—সহিষ্ণুতা ও স্বাতন্ত্র্য' এই শিরোনামে তারা প্রকাশ করেছে। 12টি অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। অধ্যায় 1-এ 'ধর্মীয়' স্বাধীনতা এবং বৈষম্য সম্পর্কে ভারতীয়দের অভিমত তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায় 2-এ ভারতে 'ধর্মীয়' বৈচিত্র্য এবং বহুত্ববাদ বিষয়ে সমীক্ষার ফলাফল প্রদান করা হয়েছে। অধ্যায় 3-এ 'ধর্মীয়' বিভাজন এবং আন্তঃধর্ম বিবাহ সম্পর্কে ভারতীয়দের মতামত খতিয়ে দেখা হয়েছে। অধ্যায় 4-এ জাতের ব্যাপারে ভারতীয় মনোভাব তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায় 5-এ ভারতে 'ধর্মীয়' পরিচয়ের উপাদানগুলি অন্বেষণ করা হয়েছে। অধ্যায় 6-এ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং রাজনীতিতে 'ধর্ম'-এর ভূমিকাটি আরো ঘনিষ্ঠভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। অধ্যায় 7-এ ভারতে ধর্মাচারের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। অধ্যায় 8-এ শিশুদের মাঝে কীভাবে ধর্ম -ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হয় সে বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায় 9-এ 'ধর্মীয়' পোশাক-আশাক বিষয়ক সমীক্ষার ফলাফলগুলির বিশদ আলোচনা রয়েছে। অধ্যায় 10-এ খাদ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সম্পর্কটি তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায় 11-তে ভারতে 'ধর্মীয়' ধারণাগুলি সম্পর্কে অন্বেষণ করা হয়েছে। অধ্যায় 12-তে ঈশ্বর সম্পর্কে ভারতীয়দের ধারণা বর্ণনা করা হয়েছে।

সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফলঃ

1. বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মাচরণ করতে পারে। 'ধর্মীয়' সহিষ্ণুতা খুব বড় একটা বিষয়। অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, নিজ 'ধর্মীয়' সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।
2. সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু (77 শতাংশ) ও মুসলমান (71 শতাংশ) কর্মফলে বিশ্বাসী। 81 শতাংশ হিন্দু 32 শতাংশ খ্রিস্টান মনে করে গঙ্গা নদি পবিত্র। 37 শতাংশ মুসলমান সুফিবাদী। 66 শতাংশ হিন্দু ও 64 শতাংশ মুসলমান মনে করে তারা পরস্পরের থেকে আলাদা। 67 শতাংশ হিন্দু ও 80 শতাংশ মুসলমান আন্তঃধর্ম বিবাহের বিরুদ্ধে। 45 শতাংশ হিন্দু অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতিবেশী হিসেবে চান না। এর মধ্যে 36 শতাংশ মুসলমানদের প্রতিবেশী হিসেবে চান না। 61 শতাংশ জৈন যারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতিবেশী হিসেবে চান না। তারমধ্যে 54 শতাংশ মুসলমানদের প্রতিবেশী হিসেবে চান না।
3. 64 শতাংশ হিন্দু মতে সত্যিকারের ভারতীয় হতে গেলে হিন্দু হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ– এক্ষেত্রে হিন্দি ভাষা বলতে পারাটাও দরকার। 53 শতাংশ প্রাপ্ত বয়স্কদের মতে 'ধর্মীয়' বৈচিত্র দেশের পক্ষে সুবিধাজনক। 24 শতাংশ (হিন্দু ও মুসলমান) উল্টোটা মনে করে।
4. 95 শতাংশ মুসলিম ভারতীয় হতে পেরে খুবই গর্বিত। 85 শতাংশ মুসলিম ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করে। 24 শতাংশ মুসলিম ও 21 শতাংশ হিন্দু বলেন যে তারা ভারতে ধর্মীয় বৈষম্যের শিকার।

5. 65 শতাংশ হিন্দু ও মুসলমান এবং 78 শতাংশ শিখ সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে দেশের একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখেন।
6. বেশিরভাগ ভারতীয়ই দেশে জাতিগত বৈষম্য নেই এমনটাই মনে করেন। যদিও 70 শতাংশ ভারতীয় বলেছেন তাদের বেশিরভাগ ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিজ জাতের।
7. 64 শতাংশ ও 62 শতাংশ ভারতীয় মনে করে যথাক্রমে নারী ও পুরুষের ভিনজাতে বিবাহ বন্ধ করা দরকার।
8. 91 শতাংশ মুসলমান ও 84 শতাংশ হিন্দু জীবনে ধর্ম খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। 84 শতাংশ মুসলমান ও 75 শতাংশ হিন্দু নিজের ধর্ম সম্পর্কে অনেক জানে বলে মনে করেন।
9. 97 শতাংশ ভারতীয় মনে করেন ঈশ্বর আছেন। 54 শতাংশ মনে করে ঈশ্বর এক কিন্তু তার প্রকাশ বহু। 35 শতাংশ মনে করে ঈশ্বর এক।
10. 50 শতাংশ ভারতীয় একনায়কতন্ত্রী শাসন কে সমর্থন করে। যেমন ধর্মভিত্তিক উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতি সমর্থন।

রোলান্ডো ইঙ্গেলহার্ড তাঁর 'Religions' Sudden Decline' গ্রন্থে পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন 2007-2019 পিরিয়ডে পৃথিবীতে ধর্ম-মনোভাব কমেছে। 49 টি দেশের মধ্যে 43 টিতেই এই কমতি দেখা গেছে। ভারত বিরাট ব্যতিক্রম। এখানে ধর্ম-প্রবণতা বেড়েছে। আলোচ্য সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে শিক্ষা ও শ্রেণি নির্বিশেষে ধর্ম ধারণার প্রাদুর্ভাব বেড়েছে।

সামগ্রিকভাবে এই সার্ভে থেকে যেটি উঠে আসছে তা হল ভারত আদ্যন্ত একটি ধর্ম-ধারণায় ঠাঁসা দেশ। যা আদর্শগতভাবে 'ধর্মীয়' বৈচিত্রের প্রতি দায়বদ্ধ কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি সেই বৈচিত্র ও সহিষ্ণুতা সংখ্যাগুরুর শর্তের উপর নির্ভরশীল। তার ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন নেই। তার হিন্দুত্ব ভিত্তিক জাতীয় পরিচিতির প্রতি দায়বদ্ধতা উত্তরোত্তর বাড়ছে। স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের প্রতিও তার ঝোঁক বাড়ছে।

বস্তুবাদী প্রত্যয় যেকোনো ধারণা পোষণ করা মানেই তা রক্ষণকামী এমনটা মনে করে না। তা তথাকথিত ধর্মীয় ধারণা হলেও। কিন্তু সেই ধারণা যদি রক্ষণকামিতার লেজুড় হয়ে তাকে আড়াল করে তাহলে তা সেই জনপদের আর্থসমাজ-সংস্কৃতির বিকাশের পরিপন্থী। আলোচ্য সমীক্ষায় সাধারণ ধারণার দিকটি যেমন উঠে এসেছে, তেমনি তা রক্ষণকামিতার প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গী নিচ্ছে তাও ফুটে উঠেছে। যা আসলে বস্তুবাদী রাজনীতির জন্য চিন্তার। তা হল ধর্ম-ধারণা ভিত্তিক উগ্র জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি।

আগামী দিনের শ্রমতত্ত্বাবধায়ক রাজনীতির কাছে নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা অত্রাঞ্চলিক জীবন-দর্শন, ইসলাম সহ অন্যান্য দর্শনকে ধর্ম-ধারণার খোয়াড় থেকে বের করেই করতে হবে। যা অস্তিত্ব নির্দেশিত জীবন দর্শন। উপমহাদেশে কালে কালে ব্রাহ্মণ্য-রক্ষণকামিতা অত্রাঞ্চলিক দর্শনকে তার খোয়াড়ে ঢুকিয়েছে। এই খোয়াড় থেকে সেই দর্শনের সারবত্তাকে প্রায়োগিক শক্তি-সংযোগ করলেই ধারণা নিশ্চিহ্ন হয়ে তাতে বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়। যার তত্ত্ব-বর্তন অস্তিত্ব দর্শন।

সপ্তম শতকের আরবীয় আর্থসামাজিক বিপ্লব ও তার মর্মভেদী ইসলামিক দর্শনকেও রক্ষণকামিতা ধর্ম বানিয়ে দিয়েছে। সেই বানানো কলকব্জা উন্মোচন করে ইসলামের অখণ্ড জীবন দর্শন তত্ত্ব মানুষের সামনে আনা দরকার। যাতে অতীন্দ্রিয় ধারণা বিলোপে বিশ্বাস সঞ্চারণে জীবন পায় বিকাশমুখীন গতি।

একইভাবে মার্ক্সবাদকে রক্ষনকামিতা ধর্ম বানাতে না পারলেও তাতে সংক্রামিত করেছে অর্থনৈতিক নিয়তিবাদ। এবং সেই সংক্রামিত ধারণাও ধর্মের থেকে কোনো অংশে কম ক্ষতিকর নয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন ২০২১

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচন জাতীয় রাজনীতির এক সংকটময় কালে অনুষ্ঠিত হল। যখন দেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মহামারির ভয়াবহতা ও কৃষি-আইন বিরোধী আন্দোলনে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো প্রকার হেলদোলহীন কর্ণপাত না করা, আসামের পরে বাংলায় এনআরসি, এনপিআর এর রাজনৈতিক চাপানউতোর, মাত্রাতিরিক্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বিশেষ করে রান্নার গ্যাসের দাম, পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতি পেট্রোপণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে দেশের মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। ঠিক তার আগেই দিল্লির দাঙ্গা, এনআরসি বিরোধী আন্দোলনকারীদের বিভিন্ন মামলায় জেলে পাঠানো হয়েছে। গত ৭ বছর ধরে সরকার বিরোধী প্রতিবাদী কণ্ঠের দমনপীড়ন, সরকারের সমালোচক সাংবাদিকদের গ্রেফতার, ঠুক কথাতেই sedition এর মত ধারায় মামলা দায়ের— ইত্যাদির মাধ্যমে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থেকেছে। একদিকে অর্থনৈতিক সংকট অন্যদিকে এই স্বৈরতান্ত্রিক দমন পীড়নের প্রেক্ষাপটে আমাদের রাজ্য তথা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচন। রাজ্যে তৃণমূলের দ্বিতীয় টার্মের সরকার চলছে।

রাজ্যের পরিস্থিতি কেমন? না, রাজ্যের আর্থ-রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অপরাপর রাজ্যগুলির সাপেক্ষে অনেকটাই ভালো। এমনকি দেশে সার্বিক অবস্থার নিরিখেও কিছুটা ভালো বলা চলে। তবে চাকুরির ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি অব্যাহত ছিল। ঠিক আগের বছর ২০২০ এর কোভিড-১৯ এর মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকা খারাপ ছিল না। র‍্যাশনিং ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী জনগণের হাতে পৌঁছে দিয়েছে। জনগণ কাজ না পেলেও খাদ্য পেয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে কৃষকরা ঋণসহ কৃষকবন্ধু প্রকল্পের সহায়তা পেয়েছে খুব সহজেই। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মানুষ স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের বিনিময়ে বিনা পয়সায় সাধারণ চিকিৎসা পেয়েছে অনায়াসেই।

এমতাবস্থায় ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচন কমিশন ৮ দফায় ভোট নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। রাজ্য সরকার তাতে অসন্তুষ্ট ছিল। সারা রাজ্যে ১০ মার্চ থেকে ২৯ এপ্রিল ২০২১, প্রায় দুমাস ধরে ভোট গ্রহণ পর্ব চলে। নির্বাচনে সরকারি দল টিএমসি, বিরোধীরা বিজেপি, বাম-কংগ্রেস ও আইএসএফ জোট এর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। ভোটগ্রহণের কালে প্রচারকার্যও চলতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, ইউপির মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ, কৈলাস বিজয়বর্গীয় প্রমুখেরা এযাবৎ কালের রেকর্ড সংখ্যক প্রচার সভা বাংলায় করতে থাকেন। বিশেষত প্রধানমন্ত্রী মোদি ও শাহ এর সভার সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। তৃণমূলের প্রচার সভাও কম ছিল না। কিন্তু নেতানেত্রীর সংখ্যা ছিল কম। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক ব্যানার্জী । ভোটদান কালে ৪র্থ দফায় ১০ এপ্রিল ২০২১ এ কোচবিহারের শীতলকুচিতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মাঠেই সিআইএসএফ- এর গুলিতে ৪ জনের মৃত্যু ঘটে।

ভোটের ফলাফলের দিকে গোটা দেশ তাকিয়ে ছিল। এই নির্বাচনের ফলাফল দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করবে বলে অনেকে মনে করছিলেন। সেই সময় এল ২রা মে ২০২১। ফল তৃণমূল কংগ্রেস তৃতীয় বারের জন্য ক্ষমতা দখল করল ২১৩ টি আসন পেয়ে। বিজেপি ৭৭ টি, জোট পেল ১ টি। ভোট শতাংশের হিসেবে টিএমসি প্রায় ৪৮ শতাংশ, বিজেপি ৩৮ শতাংশের কিছু বেশি আর জোট ৯ শতাংশ মতো।

তৃণমূল এতটা আসন পেয়ে ক্ষমতা দখল করল যা সবার কাছেই ছিল অপ্রত্যাশিত। কারণ মিডিয়া যেভাবে বিজেপির হয়ে প্রচারের মিথ্যা ফানুস বিস্তার করেছিল তাতে এই ফলাফলে ভড়কে যাওয়ার কথা। কপট মিডিয়াকে জনগণ পরাজিত করল। এমন রেজাল্টের কারণ গুলি যদি আমরা দেখি—

১। এই জয় আসলে বাঙালি সত্তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও

বিদ্যার পরিচায়ক। কেননা বাঙালি মানসিকতা কখনোই বিদ্বেষ, বিভাজন, ভেদাভেদ, হিংসা, দাঙ্গা, জবরদস্তিকে ভালো নজরে দেখেনি। বাঙালি তার চিন্তাশক্তিদাতা মনীষী রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালন, বিদ্যাসাগর, রামমোহন প্রমুখের জীবন দর্শনকে কখনোই ভুলতে পারে না। তারই প্রমাণ হল এই নির্বাচন। যে নির্বাচনে বিজেপির মতো এক বিভেদকামী, দাঙ্গাবাজ, ধর্মীয় মেরুকরণকারী, বিদ্বেষ ছড়ানো, বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ, ব্যঙ্গ, বিকৃতিকারী বর্বরদের মেনে নিতে পারেনি। যার ফলাফল এই নির্বাচনেই পরিস্ফুট। তাদের ভাষা, ভাবভঙ্গি, নারীদের অমর্যাদা বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর টিটকারিমূলক ভাষা দিদি ও দিদি, অন্যান্যদের ভাষাতেও নারীদের প্রতি অসম্মান ও অমর্যাদার পরিচয় বাঙালি পরখ করে নিয়ে ছিল। তাদের হিন্দি, হিন্দু ও হিন্দুত্ব এর আধিপত্যকামিতাকে বাঙালি বাতিল ঘোষণা করে।

২। বাঙালি প্রত্যাখান করল ধর্মভিত্তিক নাগরিকত্বের রাজনীতিকে। এনআরসি ও এনপিআর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও তার নেতৃবৃন্দের যে ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি বাংলার মানুষ আসামের এনআরসি পরবর্তীকালে দেখে নিয়ে ছিল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের যে সকল আন্দোলন চলছিল ঐ নীতির নামে অনীতির বিরুদ্ধে। তাতেও কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ছিল কঠোর ও কঠিন। মানুষকে বিনা কারণে জেলে পুরতে থাকল। আন্দোলনকারী, সাংবাদিক, সোশ্যাল ওয়ার্কার প্রমুখদের আটক করে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে রেখে দিয়েছে ও দিচ্ছে। তারা যেকোনো ভাবেই এনআরসি নামক জীবন যন্ত্রণার ফাঁদকে পশ্চিমবঙ্গসহ সারা দেশে ফাঁদতে শুরু করে। কিন্তু এ রাজ্যের প্রচারে তারা এনআরসির কথা একটি বারের জন্যও তোলেনি। না তুললে কী হবে, যা ভাবার সচেতন বাঙালি তা ভেবে নিয়েছিল। তাই নির্বাচনের ফলে তেমনই ঘটল।

৩। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প গুলি থেকে জনগণের একটা বিরাট অংশ জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে সুবিধা পেয়েছিল। যেমন- স্বাস্থ্যসাথি কার্ডের চিকিৎসার সুযোগ, খাদ্যসাথির খাদ্য লকডাউনে তাদের অনেকের জীবন বাঁচিয়ে দেয়। এছাড়াও গৃহ নির্মাণ প্রকল্প, স্কলারশিপ, কন্যাশ্রী, রূপশ্রীসহ আরো নানান প্রকল্প। যে মডেল আগের সরকারের মডেলকে ভেঙে দিয়েছিল। নির্বাচনের আগে বিরোধী দলগুলি জনগণের সামনে বিকল্প বেনিফিসিয়ারি মডেল খাড়া করতে পারেনি। যে সকল প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল তা জনগণ বিশ্বাস করেনি। আর বামেরা তো এই প্রকল্পগুলিকে সর্বদা ব্যঙ্গ করতেই ব্যস্ত ছিল। যা হিতে বিপরীত হয়েছে তাদের কাছে। নিঃসন্দেহে তার প্রভাব ভোটে পড়েছে।

৪। মহিলাদের ভোট ছিল প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি। রাজ্য সরকার মহিলাদের সংসার চালোনোর জন্য একটি অর্থ বরাদ্দের কথাও ঘোষণা করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার কথাও বলেন। যার দ্বারা নারীরা ভীষণভাবে প্রভাবিত হন। ভোটে তার ছাপ লক্ষ্য করা গেছে।

৫। 'নো ভোট ফর বিজেপি' – নামক যে গ্রুপ গড়ে উঠেছিল, তাদের ভূমিকাকেও খাটো করে দেখলে ভুল হবে এই নির্বাচনে। তারা রাজ্যের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে নিজেদের যুক্তি-বিতর্ক রেখেছিল ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে। যেটি বাঙালির আরও একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৬। কেন্দ্রের কৃষি আইনের বিরুদ্ধে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ সহ সকল রাজ্যের কৃষকরা প্রতিবাদ ও আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেই আন্দোলনের নেতারাও এই নির্বাচনে ভূমিকা নেয়। তারা প্রচার করেন বিজেপির বিপক্ষে যেন ভোট দেওয়া হয়। কেন্দ্রের দলটি যেন এ রাজ্যের ক্ষমতায় আসতে না পারেন। কারণ তারা বলেন এবং রাজ্যের রাজনীতি সচেতন নাগরিকরা দেখেছেন যে কীভাবে দিল্লিতে সেই আন্দোলনকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। তাদের উপর অত্যাচার, পীড়ন, দমন করা হচ্ছে। নির্বাচনের প্রাককাল পর্যন্ত বহু কৃষক আন্দোলনরত অবস্থাতে মারা যান। কৃষক নেতাদের আহ্বান রাজ্যের জনগণকে ভাবিয়েছিল। ভাবিত জনগণ তার নমুনাও রেখেছে।

৭। ব্যক্তি মমতা ব্যানার্জীর রাজনৈতিক আবেদন ও কৌশল, প্রচারে জনগণের একটা অংশও প্রভাবিত হয়েছে এই নির্বাচনে। এর আগের দুটি টার্মে

সরকারের ভূমিকা জনগণ পরখ করেছে। তাই এবারের তার নতুন প্রকল্প ও এজেণ্ডাগুলি জনগণ সদর্থকরূপে গ্রহণ করেছিল। তাছাড়া জনগণ দেখেছে যে এই রাজ্যে তারা নিজেদের দাবি জানাতে পারে, আন্দোলন করতে পারে। কেন্দ্রের ক্ষেত্রে তার বিপরীত অবস্থা। সেই দাবি তথা আন্দোলনেরও অনেক অংশ পূরণ হয়েছে। সবটা হয় নি।

৮। কূটনৈতিক পরামর্শদানকারী প্রশান্ত কিশোরের চালের কাছে বিজেপির কৌশল কাজে আসেনি। রাজ্য সরকার নতুন নতুন ইশ্যু তৈরি করেছে। বিজেপি তার পিছনে ছুটেছে। কেন্দ্রের ক্ষেত্রে যা বিজেপি করে, কংগ্রেস দল তার পেছনে পেছনে চলে, এখানে তার উল্টো ঘটনা ঘটেছে। জনগণের কাছে বিজেপির প্রস্তাবিত কর্মসূচিগুলি গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। জনগণ সন্দেহের চোখে দেখেছে।

৯। মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে এই নির্বাচনটি বিজেপিকে পরাজিত করার নির্বাচন ছিল। সেখানে সেয়ানে সেয়ানের লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচিত হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস একটি জনপ্রিয়তাবাদী ওয়ান উইম্যান পার্টি। হোক তা। কিন্তু গত দশ বছরে সেই মহিলার গৃহীত সামাজিক প্রকল্পগুলি ধারে ও ভারে তাকে বামপন্থীদের রিলিফ রাজনীতির থেকে বড় বামপন্থী বানিয়েছে। সন্দেহ নেই। তাই বামেদের ভাষায় খেটে খাওয়া-গরিব, শ্রমিক, কৃষক, মজদুর মেহনতিদের ভোটের আস্থা সে অর্জন করেছে।

অতএব এই বিপুল আস্থার দায়িত্বভার রাজ্য সরকারের তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উপর এসে তৃতীয়বারের জন্য বর্তাল। দায়িত্ব ও কর্তব্যের মেলবন্ধন যদি তিনি বা তার মন্ত্রীসভা না করতে পারেন, কিংবা যদি না করেন, তবে বাঙালি জনতার আবেগ, আশা-আকাঙ্খার সাথে প্রতারণা করা হবে। জনতা বিশেষত বাঙালি জনগণ কিন্তু তাকেও ক্ষমতা থেকে সরাতে দ্বিধা করবেনা।

তৃণমূলের মতো পপুলিস্ট দলের কার্যাবলীকে নিছক ডোল রাজনীতির কাণ্ডকারখানা বলে ব্যঙ্গ করলে, ভুল করবেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে জাতীয় কংগ্রেস সহ প্রায় প্রতিটি কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতায় টিকে থাকাটা সেই ডোল রাজনীতিরই বদান্যতা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ক্ষমতা দখল ও টিকে থাকার তাড়নায় দলগুলোকে মানুষের অধিকারকে একটি পর্যায় পর্যন্ত স্বীকৃতি দিতে হচ্ছে।

নিশ্চয় আগামী দিনে অধিকারের এই স্বীকৃতি রাজনৈতিক ফোর ফন্টে এসে গেলে হয়তো রাজ্য বা দেশের চেহেরায় বদলে যাবে। আপাতত এই বলেই ক্ষান্ত দিতে হচ্ছে যে জনবাদী রাজনীতিকে ডোল বলে ব্যঙ্গ করতে যাবার কারণেও রাজ্যে সিপিএম সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি পিছিয়ে পড়েছে।

বাম রাজনীতি ও ২০২১ বিধান সভা নির্বাচন

(লেখাটি নির্বাচন শুরুর পূর্ব মুহূর্তের)

প্রেক্ষাপট

(১) বাম জমানা (১৯৭৭-২০১১)

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট জমানার সূচনা। ১৯৪৬ এর খাদ্য আন্দোলন, দেশভাগ পরবর্তী সময়ে পূর্ব বঙ্গের উদবাস্তু পুনর্বাসন, ১৯৬০-৭০ দশকের ছাত্র আন্দোলন, জমিদার জোতদার বিরোধী আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন প্রভৃতি ছিল যার পূর্বপট। ক্ষমতায় আসীন হয়ে তারা জমিকেন্দ্রিক সমস্যার একধরনের সমাধান করলেন অপারেশন বর্গা কর্মসূচির মাধ্যমে। এতে করে বৃহৎ জোতের মালিকানা হস্তান্তর হল। পার্টি জমিদার বনাম কৃষক দ্বন্দ্ব জাগাতে সমর্থ হল। (সোভিয়েত তত্ত্ব বলে লোকাল ইশ্যু থেকে বৃহত্তর ইশ্যুতে জনতাকে সংযুক্ত করার কথা। পঞ্চায়েতে জনতাকে অতি সংকীর্ণ লোকাল ইশ্যুতে বেঁধে ফেলা হয়। সিপিএমের পার্টি কর্মী-ক্যাডার-মেম্বার-প্রধান-সভাপতি-সভাধিপতি সহ এলসিএম-এলসিএস-জেডসিএম-জেডসিএস-জেলানেতা ইত্যাদিদের চিন্তা-বৃত্তের স্বরূপ সন্ধানেই যার হদিস মিলবে।) পরিণতিতে ১৯৮২ এর নির্বাচনে বিপুলভাবে তারাই ক্ষমতায় ফিরল। জমিদার কৃষক দ্বন্দ্বের অবসান না ঘটলেও পার্টি সেই দ্বন্দ্ব নিয়ে আর অগ্রসর হলনা। উঁচু মাঝারি আর নিম্ন কৃষকদের সাথে সমঝোতা বা আপোষ তৈরি হল।

১৯৮২ পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে ক্ষমতা কব্জা করার মেশিনারি হিসেবে পার্টিকে পুরোপুরি আর পাঁচটি রেজিমেন্টেড পার্টির মতোই ব্যবহার করা শুরু হয়ে গেল।

পার্টি সংগঠনের ভিত্তি হয়ে উঠল লোকাল ক্ষমতা কেন্দ্র অর্থাৎ পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিক কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হলেও তা আখেরে সেই ক্ষমতা সংহত করার লোকাল হাতিয়ারে পরিণত হল। সোভিয়েত তত্ত্বের উলটো দিকে হেঁটেই তা করা হল। মুখের স্লোগান একই থাকল। স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রগুলিকে চরম আধিপত্যের ইউনিট করে ফেলা হল। প্রশাসন ও পার্টি গুলিয়ে ফেলেই যে আধিপত্যের বীজ বপণ হল।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনুগত ক্যাডার বাহিনী তৈরি করতে ১৯৭৭-১৯৯৮ অর্থাৎ দুই দশক ধরে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরে নিরঙ্কুশভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সেই লোকাল আধিপত্যের দ্বারা সংগঠিত করা হল।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একই আধিপত্য উপরের স্তর দ্বারা সংগঠিত হল।

কৃষক আন্দোলন তো আগেই সমঝোতার গাড্ডায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনগুলির আদর্শ ভিত্তিক ব্যাকপোটেন্সি না থাকায় কারখানা বন্ধের অভিযোগের কাঠগড়ায় উঠল। নতুন শিল্পদ্যোগ গড়ে উঠল না। কৃষি ভিত্তিক শিল্প সম্ভাবনার কথা মাথায় এলোনা।

জ্যোতি বসুর প্রস্থান ঠিক এই সময়েই। কর্পোরেট পুঁজির মিডিয়া সঙ্গী প্রচারিত ব্র্যান্ড ইমেজের বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এলেন। কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনার অঙ্কুর আগেই বিনষ্ট হয়েছিল। তিনি গেলেন কর্পোরেট সেজ (SEZ) অর্থাৎ পুঁজিঘন শিল্প বিনিয়োগ আকর্ষণের রাস্তায়। জমি নিয়ে বাধল গোল। রুটলেস কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত চাপানো হল সংগঠনের নিচের তলায়। সংগঠন ইতিপূর্বেই তার আধিপত্যকামিতার জন্য গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। টাটার ন্যানো প্রজেক্টকে কেন্দ্র করে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠল। তার পরিণামে বাম জমানার অবসান ঘটলো ২০১১ এর নির্বাচনে। আধ-খ্যাচড়া হলেও যে কৃষক আন্দোলনের ভিত্তিতে বাম জমানার উত্থান সেই কৃষক আন্দোলনকে হাতিয়ার করেই কংগ্রেস থেকে ছিটকে বেরোনো পপুলিস্ট তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এলো।

(২) তৃণমূল জমানা (২০১১-২০২১)

ভদ্রলোক বাবু সরকারের জায়গায় এলো প্রান্তিক

লোকেরা ক্ষমতায়। কেউ কেউ বললেন দলিত আপসার্জ। তৃণমূল কোনো রেজিমেন্টেড পার্টি নয়। এক নেতা নির্ভর একটি দল। যার শুরু ও শেষের নাম মমতা ব্যানার্জী। যে পার্টির মুখ্য এজেণ্ডা দাঁড়াল রকমারি সামাজিক প্রকল্প। ছাত্র বৃত্তি থেকে শুরু করে হরেক শ্রী প্রকল্প। একজন নারী পরিচালিত আবেগ আর নানান রাজনৈতিক দল থেকে আসা স্থানীয় সুযোগ সন্ধানী যার নেতা নেতৃত্ব।

পার্টি সংগঠন স্তরভিত্তিক না হওয়ায় কেন্দ্রীয়ভাবে দুর্নীতি তার ছায়াসঙ্গী হল। দশ বছরেও শিল্প ভিত্তিক কর্ম সংস্থান হল না। প্রাথমিক সহ আপার প্রাইমারি ও উচ্চশিক্ষায় অরাজকতা দেখা দিল। কোয়্যালিটি এডুকেশন দূর অস্ত! ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প আর সামাজিক প্রকল্প সমূহের সহায়তা এই নিয়েই রাজ্যপাটে তারা দশটি বছর কাটিয়ে দিল।

মমতা ব্যানার্জীর রাজনীতিতে বামের সাথে রিমার্কেবল প্রস্থান বিন্দু হল রাজনীতির প্রধান ফোকাস থেকে শিক্ষিত নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সম্পূর্ণ অপসারণ। তিনি ভোটের বৈতরণী পেরোবার রাস্তা নিলেন নিচের অংশে সরাসরি প্রশাসন নির্ভর সরকারি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে।

আর কী করলেন? ২০১৬ এর নির্বাচন বিজয় অভিযোগবিহীন ভাবে সম্পন্ন হলেও জনপ্রিয়তার শিখরে থাকা অবস্থাতেই ২০১৮ পঞ্চায়েত নির্বাচন করলেন এমনভাবে যাতে কংগ্রেস ও সিপিএম এর সংগঠন মাথা তুলতে না পারে। তিনি জানতেন পঞ্চায়েত স্তরে ক্ষমতায় না আসলে তারা সংগঠন গড়তে পারবে না। এই স্তরের ক্ষমতার জোরেই এরা তিন দশক রাজ্যপাট চালিয়েছে।

গায়ের জোরে এই নির্বাচনটি করে সিপিএমকে ঠেলে দিলেন আজ দেশের ক্ষমতায় থাকা বিজেপির দিকে। একই অবস্থা হল কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও। যার ফলে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টিতে ভিড়ে গেল সিপিএমের অবশিষ্টাংশ। পরিণামে সিপিএমের রিভেঞ্জ মানসিকতায় ২০১৯ সালের পার্লামেন্টারি নির্বাচনে রাজ্যের ১৮টি আসনে বিজেপি জয়ী হল। সিপিএমের ভোট শেয়ার এক ধাক্কায় ৭ শতাংশে নেমে গেল। প্রধান বিরোধী দল হয়ে গেল বিজেপি।

জাতীয় প্রেক্ষাপট

এদিকে জাতীয় প্রেক্ষাপটে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। ২০১৪ সালে ক্ষমতাসীন হয়েছে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি। সোশ্যাল মিডিয়া অর্থাৎ ইন্টারনেট মিডিয়া নির্ভরতা পৃথিবীতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াকে অনেকাংশে পিছনে ফেলে দিয়েছে। সেই কর্পোরেট মিডিয়া নির্ভরতা আর আধিপত্যকামিতাকে সাথে নিয়ে 'শক্ত' শাসক বিজেপি। যার অর্থনৈতিক এজেন্ডা কর্পোরেট মুনাফায় লাগামহীনতা আর ধর্মভিত্তিক উগ্রজাতীয়তাবাদ। এই শক্ত শাসন রূপ দিতে জাতীয় স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে একের পর এক সরকারি বশীভূত করা হয়েছে। সে বিচার বিভাগ হোক আর নিরাপত্তা বা দুর্নীতি প্রতিরোধী যে সংস্থাই হোক। নোট বাতিল, লাগামহীন ট্যাক্স, লক ডাউন বা নাগরিকত্ব আইন, শ্রম আইন, কৃষি আইন ইত্যাদিতে তার সেই চরিত্রায়ন ঘটেছে। এবং এখনো ঘটে চলেছে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল একের পর এক রাজ্যে বিরোধী দলীয় বিধায়ক কেনবেচার মাধ্যমে নিজ দলীয় সরকার গঠন। নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে চরম হাতিয়ারে পরিণত করা। তার জন্য তার সর্ববৃহৎ আই টি সেলকে কাজে লাগানো। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষোভকে ধামাচপা দেওয়া ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি স্বাধীনোত্তর সময় থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির সম্প্রদায়ভিত্তিক এই উগ্রতায় সায় দেয়নি। ১৯৭১ সালের পূর্ব বঙ্গের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন উদবাস্তু সমস্যার সময়েও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু হিন্দু হৃদয় সম্রাটের ক্ষমতা আরোহণ পরবর্তী ২০১৯ নির্বাচনের প্রেক্ষিতে সেই কথাটি আর জোর দিয়ে বলা যায়না। বিজেপি এই নির্বাচনে মোট ভোটের ৪০ ঊর্ধ্ব শতাংশ পেয়েছে।

২০১৯ এ নিজের নাক কেটে বিজেপির ছাতায় আশ্রয় নেওয়া লোকেরা বিজেপি থেকে সিপিএমে প্রত্যাবর্তন করেছে এমন কোনো খবর নেই। রাজ্যে ভোটের

দামামা বাজা ইস্তক বিজেপিই প্রধান প্রতিপক্ষ।

কংগ্রেস-বাম-সেকুলারফ্রন্ট জোট

এই প্রেক্ষায় ভুক্তভোগী কংগ্রেস ও বাম যে জোট করবেই এটা পর্যবেক্ষকরা আগে থেকেই বলছিলেন। আরেকটি নাম সামনে আসছিল আসাদ উদ্দিন ওয়েসির মুসলিম সম্প্রদায়ভিত্তিক দল মিম। যে দলটি বিহার নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ভোট কাটুয়া নামে ব্যঞ্জিত হচ্ছিল। যে কিনা মুসলিম ভোট শেয়ারে ভাগ বসিয়ে সংশ্লিষ্ট আসনে বিজেপির জয় নিশ্চিত করেছে অনেকাংশে। সে নিজেও কয়েকটি আসন পায়। ইতিমধ্যে ফুরফুরার মুসলিম পির ত্বহা সিদ্দিকির ভাইপো আব্বাস সিদ্দিকি রাজনীতিক উচ্চাকাঙ্খা প্রদর্শন শুরু করে। মিম নেতা তার সাথে বৈঠক করে। মিমের এক্টিভিটি আর পরিলক্ষিত হলনা তেমন ভাবে। কিন্তু আত্মপ্রকাশ করল আব্বাস সিদ্দিকির সেকুলার ফ্রন্ট পার্টি। সিপিএম তাকে জোট সঙ্গী করল।

অনেকেই বলছেন সিপিএম এর সেকুলার নামীয় এযাবৎ কালের রাজনীতিক সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ উলটো এই সিদ্ধান্ত আসলে টিএমসির মুসলিম ভোট কেটে বিজেপিকে সুবিধা করে দেবার জন্যই। সিপিএম কেন্দ্রীয়ভাবে তাদের রাজনৈতিক পলিসিতে আগামী পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপিকে হারানোই তাদের প্রধান টারগেট হিসেবে ঘোষণা করলেও এরাজ্যের ক্ষেত্রে সে টিএমসি ও বিজেপিকে একই ব্র্যাকেটে রেখে নির্বাচনে লড়ছে। সেখানে তাদের আক্রমণের সূচিমুখ বিজেপির প্রতি যতটা না তার চেয়ে বেশি টিএমসির বিরুদ্ধে।

২০২১ নির্বাচনঃ সিপিএমের ডিলেমা

২০১৯ সালে উনিশে রাম একুশে বাম অন্তঃসলিলা স্লোগান প্রচারণায় বিজেপি প্রধান বিরোধীর জায়গাটি দখল করেছে। সিপিএমের আব্বাস সিদ্দিকির সাথে জোট বুঝিয়ে দিল সে তার টিএমসি বিরোধী রাজনীতিকেই পাখির চোখ করছে। যদিও জাতীয় রাজনীতি উল্লেখযোগ্য বাঁক নিয়েছে। যেখানে সেই ‘শক্ত’ সরকারের বাংলা বিজয় রুখে দেওয়াই অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দল তাদের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। সিপিএমও কেন্দ্রীয়ভাবে তাই করেছে। কিন্তু তার ডিলেমা অন্যখানে।

সে ২০১১ সালে ক্ষমতা হারা হয়েছে টিএমসি দ্বারা। ২০১৮ সালে মার খেয়েছে সেই টিএমসি দ্বারা। তাকে হারিয়ে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা অথবা তাকে পরাজিত করা এই তার পণ। একদিকে জাতীয় ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট পার্টির আখ্যায় যাকে ভূষিত করছে সে, সে-ই আবার রাজ্যের নির্বাচনে তার নিজস্ব এজেন্ডায় প্রতিশোধ গ্রহণ অথবা ক্ষমতা-জয় দুই-এর কোনোটাই ছাড়তে পারছে না। এই তার ডিলেমা। যদি সত্যিই সে বিজেপিকে অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিস্ট মুখীন বলে আখ্যায়িত করে থাকে তাহলে পশ্চিমবঙ্গে তার প্রধান প্রতিপক্ষ হওয়া উচিৎ ছিল বিজেপিই। কিন্তু সে তা করে নি। তার এই রিভেঞ্জ অথবা ক্ষমতা চক্কর এবং অথবা শাসক দলের ব্যর্থতায় যদি বিজেপি ক্ষমতায় এসেও যায় তাহলে ভবিষ্যতে সে, কংগ্রেস আর টিএমসি একযোগে বিজেপি বিরোধিতা করে কিনা সেটাও হয়তো রাজ্যবাসীকে দেখতে হতে পারে।

বিধান সভা নির্বাচনের (2021) ইশ্যু প্রাদেশিক না কেন্দ্রীয়?

(নির্বাচন পূর্ব রচনা)

২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচন কেবল শাসক দল নির্বাচন নয়। কেবল গত দশ বছরের শাসক দলের উন্নয়ন-অনুন্নয়ন, ভোটব্যাঙ্ক পলিটিক্সের হিসেব, ডোল পলিটিক্সের হিসেব, বেকারত্ব-কর্মসংস্থানের হিসেব, সামাজিক প্রকল্প সমূহের লাভ ক্ষতি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবেশ, দুর্নীতি ও তার মাত্রা, কাটমানি ও তার নিয়ন্ত্রণ কিংবা লুম্পেন রাজ বা শিক্ষিতদের শাসন এসবই কেবল এই নির্বাচনটিকে বিশেষিত করছে না। এর কোনোটিই কম গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইশ্যু হল পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচন বাঙালি বিবেকের ভারতবর্ষকে শিক্ষা দেবার ইলেকশন। কেন? একথা কেন?

২০১৪ সালে নির্বাচিত কেন্দ্রের বর্তমান শাসক দল পরবর্তী নির্বাচনের অর্থাৎ ২০১৯ এর নির্বাচনে ব্যাপক মার্জিনে পুনরায় ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল ৫ বছরে তাদের গৃহীত পলিসি দেশবাসীর জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে? দেশের আর্থিক বিকাশ কতটা এগিয়েছে? সামাজিক প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়নে কতদূর অগ্রসর হয়েছে। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান কোথায়? জনতার জীবনমান, শিক্ষা, কর্মসংস্থানে আমাদের অবস্থা কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নে অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, গবেষকগণ নেতিবাচক ছাড়া ইতিবাচক কোনো উত্তর দিতে পারেন নি। তারপরেও ২০১৯ সালে তারা আগের বারের মার্জিন ক্রস করে বিপুল নিরঙ্কুশতায় ক্ষমরা লাভ করেছে। কোন বলে?– –

১) নোয়াম চমস্কিকে ধার করে বলা যায় ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট। মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে। কর্পোরেট মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়া প্রায় পুরোটাই তার কব্জায়। গোয়েবলসি প্রচার ২৪x৭ ঘটে চলেছে। প্রশিক্ষিত টেকনিক্যাল লেবার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিনিয়ত তার এজেন্ডা ফেরি করে চলেছে। সংখ্যাগুরুর ইনহারেন্ট সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করে সেন্টিমেন্ট উস্কানোর কাজ প্রতি মুহূর্তে চরম ভাবে প্রশিক্ষিত লেবার (ট্রোল আর্মি) করে চলেছে।

২) লারজার দ্যান লাইফ ইমেজের নেতা বানানো। পপুলার ধারণায় তিনিই দেশ, দেশই তিনি ফেরি করা। আমাদের নির্দিষ্ট জাতীয় চরিত্র গড়ে না উঠলেও একটি ব্যাপারে জাতীয়তা অর্জন করতে পেরেছি। তা হল 'লিজেন্ডারি ফিগারের' ধারণায় বিশ্বাস। এটি আমাদের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম উপাদান। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে তার এমবডিমেন্ট হিসেবে লোকের মগজে ঢোকানো। যে কাজ সুশৃঙ্খল ভাবে শাসক দল করে এসেছে।

৩)জাতীয় আবেগ উসকানোর মতো ঘটনা ঘটানো। গত নির্বাচনের মধ্যেই পুলওয়ামায় সন্ত্রাস হানা জাতীয় আবেগ উসকে দেয়।

৪) বিচার বিভাগ করতল গত প্রায় । শুধু বিচার বিভাগ নয় অন্যান্য স্বাধীন প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন, নিরপত্তা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সহ যাবতীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এর সম্পূর্ণ রূপে দখলদারি।

৫) CAA আইন, কৃষি আইন, শ্রম আইন প্রভৃতি আইনের মাধ্যমে একদিকে যেমন নাগরিকদের মধ্যে বিভাজন তেমনি অর্জিত অধিকার হনন করে কর্পোরেটদের অবাধ লুটের রাস্তা পাকা করে ফেলা।

৬) ইলেকটোর‍্যাল বণ্ডের মাধ্যম দুনীতিকে লিগালাইজ করে নেওয়া।

৭) দেশব্যাপী এনআরসি- এর নামে ভয়ানক পীড়ন ব্যবস্থাপনা নামিয়ে আনা। ও তার ধারাবাহিক হুমকি।

৪) পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় এসে এন আর সি ফর্মান লাগু করার হুমকি।

অর্থাৎ স্বৈরাচারী শাসকের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের পরাকাষ্ঠা গত ৭ বছরে তারা ঘটিয়েছে।

তাই রাজ্যের নির্বাচনে রাজ্যের ইশ্যু মুখ্য নয়। জাতীয় ইশ্যুই মুখ্য। ভোট অতঃপর নেতির নেতিকরণ ফর্মাটেই হবার কথা । অর্থাৎ স্বৈরতন্ত্র নাকোচ কর। প্রতারণাকে পরাজিত কর। বাংলা রাস্তা দেখাক।

শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ও নির্বাচন ২০২১

তৃণমূল নিজেই বাম?

২০১১ সালে তৃণমূল তিন দশকের বাম ক্ষমতার অবসান ঘটায়। এতে দুটি ঘটনা ঘটে।(১) মধ্যবিত্ত বাঙালি 'ভদ্রলোক' বা ' বাবু'রা ক্ষমতাচ্যুত হয়। (২) আর সেই জায়গায় প্রান্তিকরা ক্ষমতা দখল করে নেয়। তিনটি দশক তারা শাসন চালিয়েছিল 'খেটে খাওয়া ' গরিব মানুষের নামে। ব্যানার্জীও তাদের নামে শাসন চালাতে আরম্ভ করেন। তাঁর রাজনীতিতে তিনি এটি দেখাতেই সচেষ্ট হন যে তিনি সিপিএমের থেকেও বেশি বাম। যা নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্যতা পায়। পরবর্তীতে নানান জনবাদী (Dole) স্কিমের মাধ্যমে সেই পরিচয়টি তিনি পরিস্ফুট করে তুলেছেন। ২০১৬ নির্বাচনে ব্যাপকভাবে বিজয় অর্জনের পর উনি আরো এই দিকে ঝোঁকেন। স্বাস্থ্য-শিক্ষা-নারী ও শিশু উন্নয়ন প্রভৃতি দপ্তরের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায় এই স্কিমগুলি। যাতে করে একটি বিষয় কিন্তু ধীরে ধীরে রাজ্যের মানুষের জীবনে ঘটতে থাকে। টিএমসির নিজের কোনো আঁটোসাঁটো পার্টি সংগঠন না থাকায় এই জিনিসটি আরো বলবতী হয়ে ওঠে। প্রশাসনের মাধ্যমে সরাসরি সেইসব প্রকল্পের বেনিফিট নাগরিককে প্রদান করা। এতে বাম জামানার মত মাঝখানের সেতু বা পার্টি বা কমিউনিটি এপ্রোচের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ বা পার্টি পলিটিক্স কোনোটিই কিন্তু এই স্কিমগত বেনিফিট প্রদানের অন্তরায় হতে পারে নি।

জনহিতকর প্রকল্প

নির্বাচনে জয়লাভের প্রথম পাঁচ বছরে যদিও বা পার্টি বা সংগঠনের লোকাল পর্যায়ের নেতারা গ্রাম পঞ্চায়েত বা পৌরসভা ভিত্তিক 'কাটমানি' বা 'তোলা' আদায়ের লুম্পেনি কাণ্ড ঘটাতে সক্ষম হয়, ২০১৬ পরবর্তী সময়ে তাতে লাগাম আসে। বরঞ্চ স্কিমগত বেনিফিট সরাসরি উপভোক্তা রূপে জনতা পেতে শুরু করে। পার্টি সংগঠন সেখানে গৌণ হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় রাজ্যপাট চালাতে গিয়ে তিনি একটি 'বাজি' অর্থাৎ গ্যাম্বল খেলেছেন। সেটি হল সিপিএম-কংগ্রেস এর সংগঠনকে দুর্বল করা। আর তা করতে গিয়ে নিজেও সংগঠন গড়ে না তোলা। এককথায় রাজনীতির দুয়ার থেকে মধ্যবিত্ত প্রাধান্যকে চরম আঘাত হানা। তার টার্গেট নিম্ন অংশ। এই অংশ থেকেই জেতা। এখান থেকেই ইলেকশন বৈতরণী পেরোনোর ঝুঁকি। ২০১৬ নির্বাচনে এই ঝুঁকি – আর ঝুঁকি থাকে নি। বরঞ্চ তার পক্ষেই সুফল দিয়েছে। আসলে মমতা ব্যানার্জী সমাজের নিচের তলার মানুষগুলিকে নিজের হাতের মুঠোয় রাখতেই এই সকল স্কিমের প্রর্বতন করেছেন। যা বাম জমানায় আকারে খুবই বামন ছিল। মমতা ব্যানার্জীর সরকার ২০১৬ এর পর থেকে আরও বেশি প্রকল্প নিয়ে এসেছেন। যা পেতে কিন্তু জনতাকে নেতাদের হাত-পা মলতে হয় না। তাদের দাসানুদাসও হতে হয়না। জনতা সরাসরি নিজের একাউন্টে রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, কৃষক বন্ধু, স্বাস্থ্যসাথীর বেনিফিট খুব সহজেই পেয়ে যায়। মমতা তাদের প্রত্যক্ষভাবে নিজ নিজ হাতে সেই অনুদান তুলে দিয়েছে এতো বেশি যাতে সিপিএম এর রাজনৈতিক স্পেস সংকুচিত হয়ে গেছে। বিগত বাম জমানার তুলনায় শতগুণে বেশি সরকারি সামগ্রী, টাকা, খাদ্য, চিকিৎসা জনতা প্রায় অনায়াসে পেয়ে যাচ্ছে। দৃশ্যত এতেই মমতা ব্যানার্জী বড় বাম নেতা হয়ে উঠেছেন। যার ডাইরেক্ট বেনিফিট নিচের অংশের জনতা হাতে নাতে পাচ্ছে।

২০২১ এর বিধানসভার নির্বাচনের প্রাককাল থেকেই রাজ্য সরকার প্রকল্পের সংখ্যা অনেকগুণ বাড়িয়েছে, পাশাপাশি প্রকল্পগত অর্থের পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি করেছে। জনতাকে ধরে রেখে নির্বাচন পার হতে আরো কিছু ঘোষণাও তারা রেখেছেন। যা তৃণমূল তাদের নির্বাচনী সভাতে বার বার করে বলেছে। সেই ঘোষণার কাছে বাম-ডান-বিজেপি প্রভৃতি পার্টিগুলির প্রস্তাবিত

কোনো ঘোষণাই টিকতে পারেনি। বিজেপি কিছু ইশ্যু দাঁড় করাতে পারলেও বাম-ডানের জোট জনতার সম্মুখে কোনো প্রস্তাবিত প্রজেক্টই আনতে পারেনি, যে ইশ্যু, ইতিমধ্যে দেওয়া তৃণমূল পার্টি চালিত সরকারের প্রকল্পকে ছাপিয়ে যেতে পারে। বামজোট জনতার সামনে র‍্যাশনের চাল-ডাল-আটা প্রভৃতিকে ভিক্ষা, দান প্রভৃতি বলে ব্যঙ্গ করেছে। তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করলে কী হবে? সেই রেশনের চাল-আটা দিয়েই লকডাউনে কাজ না থাকা শ্রমিক-কৃষক-মজুর, খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ তাদের জীবন চালিয়েছে। সেই মেহনতি মানুষ কি সেই ব্যঙ্গ বুঝতে পারেনি? তারাও তো মানুষ। তারা ঠিকই বুঝেছে। নীরব থেকেছে। তাদের সেই হেয়, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের অপমানের প্রতিক্রিয়াও ২০২১ এর নির্বাচনে বাম শূন্য হওয়ার অন্যতম কারণ।

মধ্যবিত্ত ও সরকারি চাকুরি

বামজোট আরও একটি ইশ্যু তুলেছিল। চাকরির ইশ্যু। সেই ইশ্যুটিতে তৃণমূল সরকার কানই দেয়নি। তাদের নিজেদের মতো করে নিয়োগ দিয়ে গেছে। প্রতিবছর না দিয়ে কোনো বছরে এক সাথে অনেকটাই নিয়োগ দিয়েছে। যেমন- ২০১২-১৩ তে, ২০১৬ তে এবং কিছু সংখ্যক ২০২১ এ। মমতা সমাজের এই শ্রেণিকে পাত্তা দিতে চায়নি। কেননা এই শ্রেণিটিই পূর্ববর্তী সরকারের মেরুদণ্ড রূপে ছিল। যেটিকে ভেঙে দিয়ে এই সরকার একটা নতুন মডেল খাড়া করেছে।

এখন দেখার বিষয় কেন শাসক তৃণমূল সরকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণিটিকে রাজনীতির অঙ্গনে ব্রাত্য করে দিলেন? এই সরকার দেখেছেন যে –

১। এদের নির্বাচনী মতামতের সংখ্যাতে সরকারের গঠনে তেমন হেরফের ঘটে না।

২। শিক্ষিত অংশকে রাজনীতিতে আনলে বা গুরুত্ব দিলে তার পার্টির 'ওয়ান উইমেন পার্টি' এর ভিত্তি মূলে আঘাত হানতে পারে।

সংগঠনহীনতা

জনপ্রিয়তাবাদী তৃণমূল দল ও তার সরকার যেমন দ্রুত গজিয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি আবার পড়েও যেতে পারে। কেননা তাদের সাংগঠনিক কোনো শক্তি নেই। তারা ক্ষমতা থেকে সরে গেলেই তাসের ঘরের মতো ভেঙেও পড়বে। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, এই দলের নিচের তলার কর্মী বলে কিছুই নেই। তারা কেবলমাত্র ক্ষমতার জন্য আছে। পার্টির যেমন কোনো সাংগঠনিক নির্দেশিকা তথা গাইডলাইন নেই, তেমনি তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ নেই। যা না থাকায় জনসমাজে কে কী করছে তা পজিটিভ হোক কিংবা নেগেটিভ তা নিচের দিক থেকে উপরে যাওয়ার দিকটি নেই। মানুষ তার নিজের মতামত চায়ের দোকানেই হোক, কিংবা ট্রেনে-বাসেই হোক অথবা রাস্তাতেই হোক রাখতে পারছে। বাম আমলের মতো তার উপর নজরদারি, নিষ্পেষণ নেমে আসেনা। অতিরিক্ত চাপ রাজ্যের ক্ষমতার থেকে তাকে পেতে হচ্ছে না।

দুর্নীতি

লিবারেল বা নিও লিবারেল বাজার অর্থনীতির সাথেই যুক্ত হয়ে থাকে দুর্নীতির প্রশ্নটি। অন্যভাষায় বলা যায় রক্ষ অধিকৃত আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এথিক্স কে বুড়া আঙুল দেখিয়েই রাজপাট চালায়। তাই দুর্নীতি সেখানে তেমন কোনো ইশ্যু নয়। তবে সেই দুর্নীতির প্রকাশ কীভাবে জনসমাজে আসে তা নির্ভর করে পার্টির উপর। মানে পার্টির সংগঠনের উপর। স্তরে স্তরে বিন্যস্ত পার্টি সংগঠন থাকলে দুর্নীতিকে দুর্নীতি বলে জনসমাজ ধরতেই পারেনা। কারণ তার কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিন্তু সেই রকম সংগঠনহীন ব্যক্তি প্রধান দলে দুর্নীতি কেন্দ্রীয়ভাবেই ঘটে, যা জনসমাজ খুব সহজেই ধরতে পারে। এটাই হচ্ছে। আরো নগ্নভাবে হচ্ছে। মূলত হচ্ছে সরকারি নিয়োগ ক্ষেত্রে। যাতে সামাজিক নৈতিকতার অবনমনের দিকটি প্রকট। এর সুদূরপ্রসারী পরিণাম অত্যন্ত ভয়ানক। আগামী দিনের র‍্যাডিক্যাল রাজনীতি কীভাবে এর মোকাবিলা করে সেটাই দেখার।

প্রবন্ধ

বাঙালির বিস্মৃত ধান্য-সংস্কৃতি

ড.দেবল দেব

অনুবাদঃ মোঃ আযাদ হোসেন

দেশী ধানের একটি জাত হারিয়ে যাওয়ার অর্থ, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্কৃতির একটি চিহ্নের বিলুপ্তি।

এশিয়ার অন্যান্য সংস্কৃতির মতো বাংলার সংস্কৃতিতে ‘ভাত খাওয়া’ আহার গ্রহণের সমার্থক। সংস্কৃত ‘অন্ন’ এবং মধ্যযুগীয় বাংলা ‘ওদন’ শব্দ দুটোরই অর্থ ‘ভাত’। বাংলায় ‘ভাত খেয়েছো’ বা ‘খেয়েছেন’ এর অর্থ হল কেউ দুপুর বা রাতের আহার গ্রহণ করেছে কিনা সৌজন্য সহকারে জানতে চাওয়া। এই প্রাত্যহিক ভাষা বাঙালি সংস্কৃতিতে ভাতের অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সাবেকি বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে ধান, চাল ও ভাত জড়িয়ে রয়েছে। যেমন সমস্ত ঐতিহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে সুগন্ধী ধানের পোলাও এবং পায়েস পরিবেশন করা হয়।

বাংলা নার্সারি ছড়া পরম্পরাগত ধানের বিশেষ গুণাগুণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার শৈশব স্মৃতির এরকম পুরনো একটি ছড়াঃ

কলম-কাঠির পাতলা চিড়ে, হামাই ধানের খই
চিনি-আতপ চালের পায়েস, খাবে এসো সই।

অন্য একটি ছড়া জনৈক সওদাগর শিবের কাহিনি বর্ণনা করে । শিবকে তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা শালি ধানের চিড়ে ও বিন্নি ধানের খই পরিবেশন করে। সাথে শবরি কলা এবং কাগমারির একদা বিখ্যাত দই। এই মিষ্টি ছড়াগুলি যেমন আজ সবাই ভুলে গেছে, তেমনি শবরি কলা এবং বিভিন্ন সাবেকি ধান বাংলার খাবারের থালা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

জৈব বৈচিত্র্যের অবক্ষয়

প্রায় চার হাজার বছর আগে বাংলায় ধান চাষ শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ সময় জুড়ে প্রাচীন কৃষকরা হাজার হাজার ধানের জাত উদ্ভাবন করেছিল। প্রতিটি জাত ছিল স্থানীয় মাটি ও জলবায়ুতে অভিযোজিত। এই পদ্ধতিকেই চার্লস ডারউইন ‘কৃত্রিম নির্বাচন’ বলেছিলেন। এই সাবেকি জাতগুলোর অধিকাংশই পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশে চাষ করা হত। এগুলি ইন্ডিকা গ্রুপের ধান। অল্প সংখ্যক জ্যাপোনিকা গ্রুপের ধানও এই অঞ্চলে চাষ করা হত। বিশেষ করে গভীর জলা এলাকায়।

প্রাক-সবুজ বিপ্লব পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে ঠিক কতগুলি জাতের ধান চাষ হত তা নির্দিষ্ট ভাবে আমাদের জানা নেই। বিজ্ঞানীদের হিসেব মতো ১৯৪০ এর দশকে অবিভক্ত বাংলায় প্রায় ১৫০০০ জাতের ধানের চাষ হত। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য গবেষণা কেন্দ্রের অপ্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় বিংশ শতকের ষাটের দশকে কৃষকরা প্রায় ৫৫০০ জাতের ধান ফলাত। ১৯৬৫ সালে ভারতের সবুজ বিপ্লবের আর্বিভাবে গুটি কয়েক উচ্চ ফলনশীল ধান হাজার হাজার সাবেকি জাতকে সরিয়ে দিয়েছে এবং এখনও সরাচ্ছে।

বাংলাদেশও একই ভাবে ধানের জৈব বৈচিত্র্যের অবক্ষয়ের সাক্ষী থেকেছে । ১৯৭০ এর দশকে উচ্চ ফলনশীল ধান প্রায় ৭০০০ সাবেকি জাতকে সরিয়ে দিয়েছে। পরবর্তী দশকগুলিতে আরো শত শত জাত অদৃশ্য হয়ে গেছে। সাম্প্রতিক তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশে এখন মাত্র ৭০০-এর কিছু বেশি জাত চাষ হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় আন্তর্জাতিক সীমান্তের দুপারের

বাংলার অধিকাংশ সাবেকি জাতগুলি কৃষকদের হাতে আর নেই । সেগুলির মালিকানা কয়েকটি মাত্র জিন ব্যাঙ্কের হাতে। ব্রীহি বীজ বিনিময় কেন্দ্রে আমার নিজস্ব সংগ্রহে এরকম দেশী ধানের জাত রয়েছে ৫৭৬ টি। সম্ভবত এটাই ২০১২ পর্যন্ত বাংলায় চাষ হওয়া সাবেকি ধানের জাতের সর্বোচ্চ সংখ্যা । এগুলির অধিকাংশ মাঠ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, কিছু লুপ্তপ্রায় হয়ে কোনো একটি কৃষিজমিতে হয়তো টিকে আছে।

এই হাজার হাজার সাবেকি জাতের অবলুপ্তির অর্থ বিভিন্ন জাতগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কিত বিস্তৃত লোক-প্রজ্ঞারও অবক্ষয়। গরীব ও প্রান্তিক কৃষকদের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাও এই কারণে ঘটে। স্থানীয় মাটি ও জলবায়ুর পক্ষে উপযোগী বিবিধ ধানের জাতগুলির অধিকার কৃষকদের হাতে আর নেই। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের ধানের বিস্মৃত জাতগুলি স্থানীয় খাদ্য সংস্কৃতি এবং প্রসিদ্ধ বাঙালি রুচি গড়ে তুলেছিল। সেই অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলি ওই জাতগুলির সাথেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

সাংস্কৃতিক প্রতিফলন

নির্দিষ্ট ধানের জাত নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের খাদ্য সংস্কৃতি গড়ে তোলে। দঃ ২৪ পরগণার জয়নগরের মোয়া উৎকৃষ্ট সুগন্ধী ধান কনকচূড়ের খই দিয়ে তৈরি হত। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি এবং দঃ ২৪ পরগনার কৃষকরা তাদের বিখ্যাত মুড়ির জন্য কেলাস, ডহর নাগরা, নলপাই এবং মউল ধান ফলায়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় কম সময়ে রান্না, উন্নত স্বাদ ও সরু দানার জন্য সীতাশাল ও বাঁশকাঠি ধানের চাষ হত। চিড়ের জন্য আজিরমান, চন্দ্রকান্ত এবং মানিক কলমা চাষ করা হত।

সাধারণ মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় ধানের জৈব বৈচিত্র্য অতীব গুরুত্বপুর্ণ। এই জৈব বৈচিত্র্য লোক-পুষ্টি -প্রজ্ঞার অংশও বটে। ধানে থাকে প্রধানত শর্করা এবং খুব অল্প পরিমাণে প্রোটিন ও ফ্যাট। শুধু তাই নয়, পরম্পরাগত ধানের অনেক জাত বিটাক্যারোটিনের মতো পুষ্টির উৎস। থায়ামিন, রাইবোফ্লাভিন এবং নিয়াসিনের মতো ভিটামিন-বি, লৌহ এবং দস্তার মতো ধাতু ধানের কুঁড়াতে সঞ্চিত থাকে। কমপক্ষে ৮০টি জাতের প্রতি কেজি চালে ২০ মিলিগ্রাম লৌহ থাকে। এদের মধ্যে হরিণ-কাজলি, দুধে-বোলতা, ও ঝুলি ধানে সবচেয়ে বেশি প্রতি কেজিতে ১৩১- ১৪০ মিলিগ্রাম লৌহ পাওয়া গেছে। অন্যান্য জাতগুলি ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ। পুরুলিয়া জেলার ঔষধি গুণ সম্পন্ন গরীব-শাল জাতের কুঁড়ায় ভালো পরিমাণ ধাতব রূপো পাওয়া গেছে। রূপোর কণিকা রোগ জীবাণু নাশ করতে পারে। আন্ত্রিক রোগের চিকিৎসায় এই ধানের ঐতিহ্যগত ব্যবহারের কারণ খুব সম্ভবত এটাই । প্রসূতি মায়েদের দুধ বৃদ্ধির জন্য দুধসর অথবা দুধেশ্বর ধান উপকারী বলে বিশ্বাস করা হয়। বাঁকুড়ার কেলাস এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূতমুড়ি ধানের ফ্যান প্রসূতি মায়েদের রক্তাল্পতা রোগ নিরাময় করে বলে লোকের বিশ্বাস। পরমাই-শাল ধান শিশুদেহের বৃদ্ধি ঘটায় আর কবিরাজ -শাল রোগীর পথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হত।

রোপন থেকে ঝাড়াই মাড়াই পর্যন্ত ধানের নানা কাজের সঙ্গে বহু জটিল আচার-সংস্কার জড়িয়ে আছে। শীতকালে নতুন ধান উঠলে নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের পর একমাস ব্যাপী পৌষপার্বণ উদযাপিত হয়। এই উৎসবে ধানের বিভিন্ন পিঠে-পুলি তৈরি করা হয়। পরিচ্ছন্নভাবে ঝাড়াই মাড়াই করা আমন ধান পবিত্র বলে গণ্য করা হয় এবং দেবতার অর্ঘ্যের প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বড়দের সম্মান ও ছোটদের আশীর্বাদ করতে ধান ব্যবহার করা হয়। উচ্চ ফলনের আশায় নানাবিধ ব্রত পালিত হয়। পৌষমাসে উদযাপিত তোষলা ব্রত এই রকম একটি ব্রত। এই ব্রতে মেয়েরা ফসল ক্ষেত ঘুরে ঘুরে দেবতার স্তুতি করে। আমন ধান ও দূর্বাঘাস দিয়ে নব বধূদের বরণ করা হয়।

নির্দিষ্ট ধানের জাতের সাথে শুধুমাত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানই যুক্ত নয়। সেই অনুষ্ঠানগুলির ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে সেই জাতগুলোও বেঁচে থাকে। জামাই নাড়ু এবং জামাই-শাল ধান জামাই এর নামে নামকরণ করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের জামাই ষষ্ঠী উদযাপনের মধ্যে দিয়ে জামাইকে অভ্যর্থনা করা হয়। এসময় নানাবিধ বিশেষ

খাবার তার জন্য পরিবেশন করা হয়। দেউলাভোগ, গোবিন্দভোগ, মোহনভোগ, মোহনরস, ওলী, রাধাতিলক প্রভৃতি ধান পায়েস ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক মিষ্টান্নের জন্য অপরিহার্য ছিল।

দেশী ধানের জাতগুলির নামকরণও মজার। উদ্ভাবক-কৃষকদের নামে সুবল-শাল, অসিত-কলমা এবং দেবদুলালী জাতগুলির নামকরণ হয়েছে। খেজুর ছড়ি ও নারকেল ছড়ি জাতগুলির পুষ্পমঞ্জরী খেজুর ও নারকেলের পুষ্পমঞ্জরীর মতো গুচ্ছাকারে সজ্জিত থাকে। অন্য কিছু জাতের নাম হয়েছে প্রাণীর নামে। যদিও এই প্রাণীগুলির সাথে তার কোনো সংযোগ নেই। যেমন- ঘোড়া-শাল, হাতিধান এবং হাতিপাঁজর, হাঁসগুজি, হনুমান জটা, মুরগী-শাল, শিয়াল-শাল, শিয়াল ভোমরা ইত্যাদি। অন্যান্য অনেক জাত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের নামে নামাঙ্কিত। যেমন – ভীম-শাল, গৌর নিতাই, লক্ষ্মণ-শাল, সীতা-শাল, মেঘনাদ-শাল প্রভৃতি। দেবতার নামেও নামকরণ প্রচুর। যেমন- বিষ্ণু-ভোগ, দুর্গা-শাল, গোবিন্দভোগ, গোপালভোগ, ইন্দ্র-শাল, কালী-আশু, কালী-কোমোদ, কার্তিক-শাল, লক্ষ্মীচূড়া, লক্ষ্মী-দীঘোল, লক্ষ্মীজটা, নরসিংহ জটা এবং ঠাকুর-শাল।

সংস্কৃতির ক্ষয়

দেশীয় ধানের সমৃদ্ধ নাম ও তার অর্থ কেবল লোক-কথায় নিহিত নেই। তাদের আনুষ্ঠানিক ব্যবহারগুলিও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। তার উল্টোটাও সত্য অর্থাৎ এই ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি প্রাচীন শস্যের জাতগুলিকে ব্যবহার করে বিকশিত হয়েছে। পিঠে তৈরিতে গোবিন্দভোগ ও গোপালভোগ ব্যবহার না করলে লক্ষ্মী এবং নারায়ণের পূজা অশুভ হয় । বিবাহের অনুষ্ঠানে অতিথির জন্য সুগন্ধী ধানের ভাত না হলে চলে না। এই রকম পরম্পরাগত ধানের জাতগুলিকে গুটিকয়েক আধুনিক অসুগন্ধী জাত চাষ করিয়ে হঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ওই জাতগুলির সাথে যুক্ত অনুষ্ঠানগুলিও তাদের অর্থ হারিয়েছে।

শিল্প নির্ভর কৃষির দ্রুত আবির্ভাবের ফলে তোষলা ও পুণ্যি পুকুর ব্রত, ইতু পূজা, ইঁদ পূজা এবং নীলষষ্ঠী প্রভৃতি ধান-উৎপাদন সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত যুক্ত অনুষ্ঠানগুলি বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে। একই ভাবে জামাইনাড়ু ও জামাই-শাল ধান না থাকায় জামাই-ষষ্ঠী উদযাপন কৃষি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। গোপালভোগ, গোবিন্দভোগ, মোহনভোগ অথবা ঠাকুর-শাল জাতের ধান অমিল হওয়ায় লক্ষ্মী ও সত্যনারায়ণ পূজার অনুষ্ঠানের আনন্দ ও পবিত্রতাও উধাও।

ধানের ওই সমস্ত জাত হারিয়ে যাবার ফলে উল্লিখিত আচার-সংস্কারগুলির শব্দার্থগত গুরুত্বই কেবল হারায়নি। সামাজিক ও ঐতিহাসিক পেক্ষাপটসহ বহু মূল্যবান খাবারের স্বাদ-গন্ধও হারিয়ে গেছে। সীতাভোগ ধান থেকে প্রস্তুত বর্ধমান জেলার বিখ্যাত মিষ্টান্ন সীতাভোগ আজ লুপ্ত। আজকের সীতাভোগ আধুনিক ভ্যারাইটি যেমন স্বর্ণ ধানের চাল দিয়ে তৈরি হয়। নামটা কিন্তু ভুলে যাওয়া সেই ধানের নামানুসারেই রয়ে গেছে।

আরো অসংখ্য জাতের ধান স্বাদ ও গন্ধের উপযোগিতায় বিবিধ খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত হত। সেগুলি আজ হয় বিস্মৃত অথবা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন দক্ষিণবঙ্গের জয়নগরের কনকচূড় ধানের খইয়ের খুব চাহিদা থাকত। কারণ খই ভাজার পরও তার মধ্যে সেই ধানের সুগন্ধ পাওয়া যেত। কনকচূড়ের চাষ-এলাকা দ্রুত কমে যাওয়ায় আধুনিক অসুগন্ধী ধানের তৈরি নকল 'জয়নগরের মোয়া' বাজার জাত হতে থাকে ।

সাবেকি ধানের জৈব বৈচিত্র্যের দ্রুত অবক্ষয়ের ফলে বাংলার গ্রামীন ভূচিত্রের দৃশ্যগত সৌন্দর্য্যও হারিয়েছে। ধানের খড় দিয়ে নির্মিত নয়নাভিরাম কুঁড়েগুলি আর দেখা যায় না। এখন গ্রামের কুঁড়ের ছাদ এসবেসটস বা টিনের – যা এদেশের আবহাওয়ার চূড়ান্ত অনুপযোগী। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ নতুন জাতের ধানগুলির খড় অনেক বেঁটে এবং কম টেকসই। দেশি জাতের খড় এজাতীয় চালার পক্ষে উপযোগী ছিল। আধুনিক বাংলার ধানের জৈব বৈচিত্র্য নষ্ট হবার পরিণামে বাঙালি জীবনের জড়-উপকরণও যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সেই দিকটি লোকচক্ষুর

অগোচরেই থেকে গেছে।

অর্থনীতিবিদ ও ভূ-বিদরা জমির ব্যবহার পরিবর্তনের কথা বললে প্রাকৃতিক ভূচিত্র মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে কীভাবে পরিবর্তিত হয় সেই প্রক্রিয়ার কথা বলেন। জোরটা থেকে যায় অর্থনৈতিক কাজকর্মের জন্য জমির ব্যবহারের উপর । শস্যের জৈব বৈচিত্র্য ধ্বংসের অতিরিক্ত পরিণাম, সেই জৈব বৈচিত্র্যের সাথে ওতপ্রোত যুক্ত স্থানীয় সংস্কৃতির অবলুপ্তি। এই দিকটি অনালোচিতই থেকে যায়।

হাজার হাজার সাবেকি জাত ও তার সাথে ওতপ্রোত যুক্ত সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা হারানোর অনিবার্য পরিণাম শব্দ, বাক্যাংশ ও ভাষার কথ্য পরম্পরার ধ্বংস সাধন। আর্থসামাজিক অপ্রাসঙ্গিকতা ও সাংস্কৃতিক অর্থহীনতার কারণে বাঙালি ঐতিহ্যের বহু রীতি ও আচার-সংস্কার ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত । এক সময় এগুলিই বাঙালি সংস্কৃতির আত্মপরিচিতি গড়ে তুলেছিল।

(ড. দেবল দেব প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী এবং ইকোলজি-বিশেষজ্ঞ। তিনি দেশীয় বীজের বৈচিত্র্য সংরক্ষণের কাজে অনলস যুক্ত। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বসুধা গবেষণা ফার্মের তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্রীহি ধান বীজ ব্যাংকেরও প্রতিষ্ঠাতা। নিবন্ধটি Forgotten Food শিরোনামে ৬ মার্চ ২০২১, *Scroll* ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। Forgotten Food : Culinary Memory , Local Heritage and Lost Agricultural Varieties in India শীর্ষক প্রজেক্টের অংশ এই নিবন্ধটি।)

আমিত্ব সংগ্রাম

কিংশুক সন্ন্যাসী

আমিত্ব সংগ্রাম কী

আমিত্ব সংগ্রাম পদ্ধতির বিশ্লেষণের আগে জানা দরকার কীসের সংগ্রাম এবং কার সাথে সংগ্রাম। আপনাতেই আপন ভোগের জন্য মানসরক্ষণকাম প্রবৃত্তির সাথে 'আমি'র সংগ্রাম। আপনাতেই আপন ভোগ অর্থাৎ মানুষের নিজের চেতনার আনন্দভোগ লক্ষ্যেই এই সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। কারণ এই ভোগ পেতে গেলে এমনি এমনি পাওয়া যায় না, আয়াসের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায়। মানসরক্ষণকামের সাথে 'আমি'র বিরোধ কেন বাধে? 'আমি' তার স্বীয় লক্ষ্যে গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেই এই বিরোধ আসে। আপন ভোগ লক্ষ্যে পদক্ষেপ করলেই শ্রম প্রয়োগ করতে হয়। শ্রমমূর্তনার মাধ্যমে তাতে শ্রমমূল আসে। কিন্তু এই মূল্যের অধিকার ও অনধিকার নিয়েই শুরু হয় সংগ্রাম। মানসরক্ষণকাম মানুষের সৃষ্ট মূল্যকে নিয়ে শুরু করে বিরোধ। কারণ মানসরক্ষণকামের ঢাঁসাই হল শ্রমচুরি করা ও অনধিকার দখলদারিত্বের চোরাই শেকড় বসানো ।'আমি'র অন্তরালে প্রবৃত্তির হাত ধরে অর্থাৎ শয়তান হয়ে 'আমি'কে চুরি করেই এই কান্ড সে ঘটায়। যাকে বলে নিজের ঘরে নিজেই সিঁধকাটা। মানসরক্ষণকাম চোরাই শেকড় বসিয়ে 'আমি'র উপর দাপট ও চিকন দাপট চালাতে থাকে। 'আমি'কে নেতির পাঁকে ফেলে নানান অপকর্ম করায়। তার উপর অত্যাচার করে, খবরদারি করে ও অশান্তি ঘটায়। পরিণামে ব্যাহত হয় আমিত্ব বিকাশেয় প্রেম অর্থাৎ আমির উর্ধ্বগমনের শিখরবাচক লক্ষ্যের বিচ্যুতি ঘটে। এটিই সংগ্রামের কারণ। যার জন্য সম্পাদ্য হল সল বা 'আমি'র ভোগস্বৈর প্রতিষ্ঠা ও অধিষ্ঠার অর্থাৎ সলাত কায়েম।

মানসরক্ষণকাম কী

মানুষ জন্ম থেকেই আত্মকেন্দ্রিক, জড়াকাঙ্খী ও স্বার্থপর। কিন্তু কেন তার এই রূপ? মানুষের সত্তায় দুটি মেরু। একটি তাকে কাজে তথা আপন সৃষ্টিতে মুখর করে তোলে। চেতনার তৃপ্তির অন্বেষণে প্রাণিত করে। জীবনের ছন্দ নিয়ে আসে। ছান্দিক জীবন হয় সুরেলা। চিত্ত হয় উৎফুল্ল। চেতনা হয় সজীব-সতেজ। সত্তার এইরূপ ক্রিয়াশীলতার শক্তিই ইতিবাচক বা পজিটিভ মেরু। যে শক্তি চেতনাকে আত্মবিকেন্দ্রিক করে সৃষ্টির নিয়মানুগ করে।

মানব সত্তাতেই ঠিক তার বিপরীতমুখীন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যে অপশক্তি মানুষকে সৃষ্টিশীলতার বিপরীতে টেনে ধরে। যে টানে পড়ে সত্তাবদ্ধ 'আমি'কে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর করে তোলে। তখন সেই 'আমি' আর নিয়ম মানে না। বেনিয়ম বা অনিয়মে পড়ে নিজ দেহ মনের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। জীবন হয় অসুর। আসুরিক জীবনে না থাকে ছন্দ। না ওঠে সুর। জীবন তখন বড়ই জ্বালাময়। সত্তার এই আত্মকেন্দ্রিক মানস তখন তাৎক্ষণিকতায় যা তার অধীনে থাকে তাকেই রক্ষা করতে থাকে। যদি কোনো মূল্য সে অলরেডি সৃষ্টি না করে থাকে তবে তার নিজ সত্তাটাই মানসপুঁজি হয়ে যায়। সেই মানসপুঁজি মূল্য সৃষ্টি করলে সেই মূল্যকে তখন সে পুঁজিমানসে রূপান্তর ঘটায়। এই সকল অপকাণ্ড সত্তার যে মানসে ঘটায় তাকেই বলে মানসরক্ষণকাম।

মানসরক্ষণকামের খপ্পরে

মানসরক্ষণকাম 'আমি'কে কেমন করে আড়াল করে আসুরিক কাণ্ডকারখানা চালায়? মানসরক্ষণকামের রক্ষ ইন্ধনী জালে 'আমি' আটকা পড়ে গেলেই তার জীবন সুরের ছন্দপতন ঘটে। অর্থাৎ জীবন লক্ষ্য স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়। অসুর বনে যায়। আসুরিক জীবনটা কঠিন ও অবোধ্য হয়ে পড়ে। এককথায় মানুষের মানসরক্ষণকাম প্রবৃত্তির হাত ধরে শয়তান হয়ে মানুষের ঘাড়ে চেপে নিলে মানব জীবন তথা জীবনলক্ষ্যের সহজ-সরল তত্ত্বটি হয়ে যায় কঠিন, দুর্জ্ঞেয় ও অধিবিদ্যা। মানুষকে তখন প্রবৃত্তি যেভাবে চালায়, মানুষও সেভাবে চলে। তার 'আমি' তো তখন নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই। লাগামটা মানসরক্ষণকামের হাতেই চলে যায়। ফলে-

যেমন নাচায়, তেমন নাচি

যেমন চালায় তেমন চলি
যেদিক টানে সেদিক যাই
একেবেঁকে গোল্লা কেটে জট পাকাই।

এভাবেই জীবনের সহজ-সরল পথটা এঁকেবেঁকে ঘূর্ণির পাকে আবর্তিত হতে হতে ইন্দ্রিয়গুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যে ক্লান্তিতে মানুষ তখন বলে, সবই তো উপরওয়ালার ইচ্ছা। তিনি যেমন চালাচ্ছেন, তেমন চলছি– এই ধরনের অলৌকিক ধারণার অন্ধকারের গহ্বরে নিজেকে নিমজ্জিত করে। ধারণান্ধকার গুহায় পথ না পেয়ে এটা ওটা দেখে রাহুর গ্রাসে আতঙ্কিত হয়। আতঙ্কের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে আবারও নানান বুজরুকি জালে আটকা পড়ে। জলপড়া, তেলপড়া, তাবিজ-কবজ, সুতো, ধাগা বাঁধতে থাকে। ঐ অলৌকিকতার উপর ভর দিয়েই এসব চাপাতে থাকে। ধারণার উপর ভর দিলে তো আর শক্তি পাওয়া যায় না। এক ধারণা থেকে আরও তস্য ধারণার কুহকী কুহেলিকার সংক্রমণ ঘটাতে থাকে।

জিন-ইনসান তত্ত্ব

তবে এর থেকে বস্তুগতভাবে মুক্তির উপায়? সহবৃত্তিক কৃৎকলায় মানসরক্ষণকাম প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতে মানব আরূপ দেহটি আমিত্বিক বার্তমানিকতায় নিজের দখলে নিয়ে নিলে আমিত্ব বিধৃত গোটা জীবন তাতে পরিদৃষ্ট। অর্থাৎ মানসরক্ষণকামকে পরাজিত করে 'আমি' সেই অন্ধকার কিক্ষিন্ধ্যার অধিবিদ্যার অজ্ঞেয়তার অচেতন থেকে চেতনার উর্ধ গমনে তার শিখরে নিজেকে অধিষ্ঠিত করে। এই সাধিত সাধনায় জীবনের সকল পরত খুলে যায়। কিক্ষিন্ধ্যা দূর হয়ে আলোকিত হয়। এই আমিত্বিক দৃষ্টি অর্জিত হলেই দৃষ্টি প্রযৌক্তিক কৃৎকলায় আমিত্বও লক্ষ্যবস্তুতে অধিষ্ঠেয়। এই তত্ত্বই হল জিন-ইনসান অর্থাৎ আলো-আঁধার, অবন্ধুত্ব-বন্ধুত্ব, ঢাকা আর খোলা।

জিন-ইনসান তত্ত্বে কী বলা হল? প্রবৃত্তির অন্তরালে 'আমি' নিজেকে কুফর করে নিলে বা ঢেকে নিল 'আমি' হয়ে যায় কাফের। আর কুফর হওয়া অর্থাৎ নিজেকে ঢেকে নেওয়ার কারণে যে অন্ধকার জীবন তা হয়ে যায় জিন। আর তত্ত্বটি অবগত না হওয়ার কারণে মানুষ রক্ষ ইন্ধনে অতীন্দ্রিয়তাবাদের আগ্রাসনে পড়ে। এর থেকে বেরনোর একমাত্র উপায় ইমান মানে আমিত্ব বিশ্বাস। যে বিশ্বাসে প্রবৃত্তির নিবৃত্তিক সহবৃত্তিতে 'আমি' হয় মোমেন। আর মোমেন হওয়ার কারণে আলোকিত জীবন হয় ইনসান।

আমিত্ব সংগ্রাম পরিচালনার পদ্ধতি

সংগ্রাম পরিচালনার পদ্ধতি হল শ্রম তত্ত্বাবধায়ন রণনীতি। এই রণনীতিতে শ্রমিকের শ্রমমূর্ত মূল্যমান আবশ্যিক মূল্যের সমর্থন যোগ্য। এই সমর্থন যোগ্যতার অর্জনই হল উদবৃত্ত মূল্য নিয়োগিক জাকাত প্রযুক্তি। অর্থাৎ যা আমিত্ব প্রতিষ্ঠা বা সলাত কায়েমের যোগ্যতম রণনীতি নির্ধারক। তার মানে কী দাঁড়াল? সলাত কায়েমের জন্য জাকাত প্রযুক্তিতে আসতেই হবে। তা করতে আমিকে অচেতন-চেতন-দৃষ্টি-প্রেম-দ্বন্দ্ব-দহন-মুক্তি-অধিষ্ঠানে সাত তাবাক বা সপ্তস্তর পেরোতে হয়। যা অত্রাঞ্চলিক দর্শনে মানবকৃষ্ণ থেকে শ্রীকৃষ্ণে উত্তরণে রা-ধা প্রযৌক্তিক কৃৎকলা। যাতে 'আমি'র শ্রমমূল্যের আমিত্ব ভোগবাচক ত্যাগের আমিত্ব যোগ্যতায় অর্থাৎ আবশ্যিক মূল্যের সমর্থন যোগ্যতায় উদবৃত্ত মূল্য নিয়োগিক যোগ্যতার অর্জনেই আমি বিজয়ী, প্রতিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠিত হয়।

শ্রম তত্ত্বাবধান

উপরের অনুচ্ছেদে উল্লেখ যে, আবশ্যিক মূল্য ভোগ করতে গেলে আগে তার সমর্থন প্রয়োজন। কীসের সমর্থন? না, যে মূল্য মানুষ তথা শ্রমিক ভোগ করবে মানে তার প্রয়োজনীয় চাহিদার পূরণ ঘটাবে। যে পূর্তি তার ভোগ্য হবে না ভোগান্তি হবে তা নির্ভর করছে, সেই আবশ্যিক মূল্যের সমর্থনযোগ্যতার জন্য উদবৃত্ত মূল্যের নিয়োগ ঘটিয়েছে কিনা। অর্থাৎ শ্রমমূল্যের উদবৃত্ত মূল্য সামাজিক ট্রাস্টে অর্পণ করলে তার আবশ্যিক মূল্যভোগ তথা জীবনভোগ হবে। তার অন্যথা করলে জীবন ভোগান্তিতে পড়বে।

উদবৃত্তের নিয়োগ তথা নিযুক্তি কোথায় কীভাবে করবে? তার তত্ত্বাবধায়ন দায়িত্ব আর্থসামাজিক ট্রাস্ট কর্তৃত্বের। ঐতিহাসিক ইসলামে যে সামাজিক ট্রাস্ট হল বায়তুল ফাণ্ড। অতএব এই ফাণ্ড কোন নেতৃত্বের অধীনে থাকবে? রণ নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে। যে নেতৃত্বের নির্বাচনও উদবৃত্ত প্রদানকারী মানুষের রণনৈতিক নির্বাচনেই সম্পন্ন হতে হয়।

আবশ্যিক মূল্যের যোগ্যতার অর্জনে উদবৃত্ত মূল্য ত্যাগে আর্থসমাজে ভিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার কেউ থাকে না। ভিখারিও নেই, দাতাও নেই।

বস্তু নিরিখে সামাজিক অসামাজিক

আযাদ রহমান

সমাজ

ব্যক্তি শ্রম করে মূল্য উৎপাদন করে। আবশ্যিক মূল্যে জীবন ধারণ করে। এটি করতে গিয়ে তাকে মূল্যের বিনিময় করতে হয়। মূল্য বিনিময় মানে একের শ্রমে উৎপাদিত মূল্যের সাথে অন্যের শ্রমে উৎপাদিত মূল্যের বিনিময়। অর্থাৎ একটি উৎপাদন কেন্দ্রিক সুতো ব্যক্তি মানুষগুলোকে জুড়ে দিচ্ছে। এই সুতোটার নাম সমাজ।

উদাহরণ নেওয়া যাক।

কৃষক পটল চাষ করল। এক বিঘা। বীজ সার কীটনাশক বাজার থেকে কিনল। পটল ফলল ১০ কুইন্টাল। কিন্তু সে ধান ফলায় নি। কাপড় বানায় নি। অন্য সবজি চাষ করে নি। পোল্ট্রি চাষ করে নি। হরেক জিনিস তার লাগবে। এইগুলো সে কোথায় পাবে? পটল বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত মূল্যের আবশ্যিক অংশ ধরা যাক ২০০০ টাকা। এই টাকা দিয়ে সে বাকি সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করে। সে যখন ক্রয় করছে, সে আসলে তার উৎপাদিত মূল্যের সাথে অন্যের উৎপাদিত মূল্যের বিনিময় করছে। কারণ, তারাও একই কাণ্ড করছে জীবন ধারণের জন্য। এইভাবেই সেই অদৃশ্য সুতো তৈরি হচ্ছে। যার নাম সমাজ।

সমস্যাটা কোথায়?

মূল্য উৎপাদিত হয়ে যাবার পর মানুষ তার বিনিময় কীভাবে করে? সে কি তার নিজের প্রয়োজনীয় অংশ অর্থাৎ আবশ্যিক মূল্য নিয়ে বাকিটা সমাজ-কর্তৃত্বে ত্যাগ করে? করে না। সে আসলে সংরক্ষণী হাতে সেই বিনিময় করে। 'সংরক্ষণী হাত' হল সেই হাত যা বিকাশের স্বাভাবিক ছন্দকে ব্যাহত করে। কীভাবে? মূল্যের সামাজিক অংশ অর্থাৎ উদবৃত্ত হোর্ড করে। তো এই সংরক্ষণী হাত একদিকে আর অন্যদিকে বিকাশের স্বাচ্ছন্দ্য চাওয়া মন– দুই এর দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দের সাথে ট্রাডিশন বা ঐতিহ্য যুক্ত হয়ে গেলে সংরক্ষী মন অবচেতন হয়ে পড়ে। এবং তার সংরক্ষী প্রবণতা বেড়ে যেতে থাকে। এই মন যতক্ষণ ব্যক্তিকে ব্যক্তিপ্রধান অনুভূতিতে বিব্রত করে ততক্ষণ ব্যক্তি অসামাজিক। ব্যক্তির বস্তু অর্থাৎ ন্যায় অর্থাৎ সত্যের চর্চা থাকলে এই সংরক্ষী মন ইন্ধন পায় না। রক্ষণ মানস অর্থাৎ রক্ষণকামিতা লাগাম ছাড়া হয়না। ব্যক্তি অসামাজিক বিশেষণে বিশেষিতও হয় না।

একটু বিশদ করা যাক।

রক্ষণাত্মক মানস

কেন এই রক্ষণাত্মক মানস? সেটি সৃষ্টি-উৎস গত। ব্যক্তিসত্তার দুই দিক। আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মবিকেন্দ্রিক দিক। আত্মকেন্দ্রিক দিকটিই হল রক্ষণ মানস। যা বিকাশ বিরোধী। এর নাম দেয়া যাক মানস রক্ষণকাম। যা ব্যক্তির মানস-পুঁজি। যা পরবর্তীতে পুঁজি-মানসে রূপ নিয়ে নেয়। পরিণামে সেই মানসরক্ষণকাম সংক্রামিত ব্যক্তি প্রাকৃতিক সম্পদে শ্রম প্রযুক্ত হয়ে মূল্যরূপ নিলে তা দখল করতে থাকে। পুঁজি-মানস খপ্পরে এই দখলের কোনোই সীমা থাকে না। এই মানস দখলীকৃত মূল্যের বিনিময় সংরক্ষণী হাতেই করে। যাতে আর্থসামাজিক সম্পদ ব্যক্তি-কুক্ষির আওতায় থেকে যায়। পরিণামে আর্থসমাজে বেকারি দারিদ্র ইত্যাদির সংক্রমণ ঘটে। অর্থাৎ বিকাশ ব্যাহত হয়।

আত্মবিকেন্দ্রিক চরিত্রে ব্যক্তি তার আত্মকেন্দ্রিক কুহেলি নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হয়। মূল্য চেতনা আয়ত্ব করে। মূল্যের বিভাজন ঘটায়। আবশ্যিক গ্রহণ করে। সামাজিক সম্পদ অর্থাৎ উদবৃত্ত মজুত করে না। অর্থাৎ ব্যক্তি-মালিকি ধনের পাহাড় গড়েনা।

বরঞ্চ কোন অশুভ শক্তি সেই পাহাড় গড়ার ইন্ধন দেয় সেটি চিহ্নিত করে। সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশ হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হয়।

ব্যক্তি যখন নাগরিক

ব্যক্তি যখন ঔচিত্য সচেতন তখন সে নাগরিক। কথাটি ব্যাখা করা দরকার। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই জানা দরকার ব্যক্তির জীবনের মাত্রা সমূহ।

ব্যক্তির জীবন বহুমাত্রিক। সে পারিবারিক ভাবে পরিবারের সাথে যুক্ত। দাম্পত্য সঙ্গীর সাথে দাম্পত্য মাত্রায় যুক্ত। শ্রমক্ষেত্রে শ্রম তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃত্বের সাথে যুক্ত। সেই অনুষঙ্গে সহকর্মীদের সাথে যুক্ত। এই পারিবারিক, দাম্পত্য বা শ্রমক্ষেত্রীয় যাবতীয় কিছুর ধারক অর্থাৎ আর্থসামাজিক ক্ষমতার সাথে তার সম্পর্কের মাত্রা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ তার উদবৃত্ত যথাযথ ভাবে আর্থসমাজে বিন্যস্ত হচ্ছে কিনা এই প্রশ্নে ক্ষমতার প্রতি নজর রাখা নাগরিক চরিত্রে প্রধান বৈশিষ্ট্য। এদিক ওদিক দেখলে ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা, কঠিনতর প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করা নাগরিক কর্তব্য।

তার এই বহুমাত্রিক জীবন পরিসরের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে তার কর্তব্য ও অধিকার। অন্যদের থেকে চাওয়া-পাওয়া এবং নিজের দিক থেকে দিতে পারার ক্ষমতাগত দিক। এই পরিসরগুলিতে যথাসময়ে যা করণীয় আর যা বর্জনীয় তা নির্বাচনের ক্ষমতাই হল ঔচিত্য বোধ।

এই বোধ প্রাণবন্ত হতে পারে ব্যক্তি যদি বস্তু-চার্চিক হন। বস্তু-চার্চিক মানে ন্যায় চার্চিক অর্থাৎ সত্যের চর্চাকার। সেটি হতে গেলে ব্যক্তিকে তার 'রক্ষণাত্মক মানস' এবং 'সংরক্ষী মন' সচেতন হওয়া একান্ত জরুরি। এবং সেই সাথে ঐতিহ্যগত সেন্টিমেন্টকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলার সাধনা চায়। যা না হলে জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রামী চালিকা শক্তি গোড়াতেই সবল হতে পারে না। বস্তু চার্চিক নাগরিক চরিত্র অর্জিত হলেই ক্ষমতার যেকোনো ধরণের বিকৃতির বিরুদ্ধে সে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে পারে। প্রয়োজনে সেই ক্ষমতার দরবারে ডেপুটেশন দিতে পারার নির্ভীকতাও দেখাতে পারে। হোক না সে ক্ষমতা ভীষণ দৌর্দন্ড প্রতাপ!

ব্যক্তি যখন রাজনীতিক

ব্যক্তি যখন মূল্য সচেতন তখন সে রাজনৈতিক। কীসের মূল্য, তার স্বরূপ কী? শ্রমমূল্য। তার বেঁচে থাকার ভিত যে শ্রম সেই শ্রম প্রয়োগ করে যে মূল্য উৎপাদিত হল সেই মূল্য স্বরূপ সম্পর্কে সচেতনা। সে আর্থসামাজিক কোন ক্ষমতা-কর্তৃত্বে তার শ্রম দিচ্ছে। তা কি শ্রম তত্ত্বাবধায়ক বিকাশনী অর্থনীতির প্রযোক্তা কর্তৃত্ব না রক্ষ অধিকৃত জড় অর্থনীতি বা পুঁজি অর্থনীতির প্রযোক্তা কর্তৃত্ব। এ তাকে জানতে হয়।

তাকে জানতে হয় মূল্যের বিভাজন। প্রাপ্ত মূল্যের আবশ্যিক ও উদবৃত্ত অংশ। আবশ্যিকে দিন যাপন কষ্টদায়ক কেন তাও তাকে জানতে হয়। আবশ্যিক মূল্য, মজুরি আর দামের সম্পর্ক কী তাও তাকে জানতে হয়। এই জানাতেই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে আর্থসামাজিক উৎপাদনের ফলস্বরূপ যে উদবৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হল তা ব্যক্তিমালিকানায় মুনাফা নামে, ধন নামে কীভাবে কুক্ষিগত হয়। আর্থসমাজ কীভাবে পরবর্তী জেনারেশানের শ্রমক্ষেত্র সংকোচনের অর্থাৎ বেকারত্বের কব্জায় পড়ে।

এইভাবে মূল্যচেতনা তাকে এটা জানিয়ে দেয় আর্থসমাজের দখল অর্থাৎ ক্ষমতা কার হাতে। সেই ক্ষমতার স্বরূপ কী। সেই ক্ষমতা ব্যাপক জনতার শ্রমমূল্য কীভাবে কুক্ষি (কর্পোরেটি) মালিকানায় হস্তান্তর করে। এই জ্ঞান অত:পর তাকে রক্ষ অধিকৃত শোষণী ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠনের রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞে একজন একটিভিস্ট হিসেবে গঠন করে।

ব্যক্তি যখন সামাজিক

ব্যক্তি যখন মূল্যের বিনিময় সচেতন তখন সে সামাজিক। অর্থাৎ ব্যক্তি সামাজিক না অসামাজিক তা নির্ভর করে সে মূল্যের বিনিময় সচেতন কি না তার উপর।

মূল্যের বিনিময় সচেতন ব্যাপারটি কী?

ধরা যাক ব্যক্তির শ্রমক্ষেত্রে প্রাপ্ত মূল্য ২০০০ টাকা প্রতি দিন। ব্যক্তির প্রতিদিনের পুনরুৎপাদন মূল্য অর্থাৎ আবশ্যিক মূল্য ১২০০ টাকা। এই ১২০০ টাকা দিয়েই সে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনবে। এই টাকা বাদে বাকি টাকা অর্থাৎ ২০০০-১২০০=৮০০ টাকা সে সঞ্চালনের বাইরে রেখে দেবে। কীভাবে? হোর্ড অর্থাৎ মজুত করে। এতে কী হবে? এই ৮০০ টাকা ইনটু x পরিমাণ টাকা আর্থসামাজিক উৎপাদন ক্ষেত্রের বাইরে রয়ে যাবে। ফলে আর্থসামাজিক বিকাশ ব্যাহত হবে।

যে মন মূল্য বিনিময় সচেতন নয় সে এইভাবে ব্যক্তি কুক্ষির পাহাড় জমিয়ে ফেলতে পারে। আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ক্ষমতা রক্ষণকামী হলে সে সেই সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাও সেজে যেতে পারে। সে 'সমাজ সেবক' খেতাবও পেতে পারে।

কিন্তু আসলে সে যে মুহূর্তে মূল্যের বিনিময় সচেতন নয় অর্থাৎ কোনো না কোনো ভাবে উদবৃত্ত মূল্য মজুত করে সেই মুহূর্ত থেকেই তার বিশেষণ হল 'অসামাজিক'। কারণ সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে সে বাধা স্বরূপ। কীভাবে সে এই বাধা হয় তা উপরোক্ত মূল্যের হিসেব থেকেই পরিষ্কার হয়।

আরো একটি ঘটনা এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে।

রক্ষণকামী ক্ষমতা চক্রের কোলে সে ঐতিহ্যের সাথে লেপ্টে যায়। এই লেপ্টানিতে সে পুরোপুরি অবচেতন হয়ে যায়। তার এই অবচেতন মনের তখন একটাই কাজ আর্থসামাজিক মূল্যবিন্যাস বিগড়ে দেওয়া। কম দরে শ্রম কেনা আর বেশি দরে বেচা!

এই মূল্যবিনিময় অসচেতন এবং অবচেতন মন ব্যক্তি প্রধান অনুভূতিতে বিব্রত হয়। বিব্রত করে। কে তাকে মানলো না, কে তাকে সম্মান দিল না, তার এত নিঃসার্থ কাজ! সে সমাজের কাজ করে ইত্যাকার অসংখ্য ফণাতোলা আবর্তে আমিত্ব গঠনশীল মানুষদের সে নিন্দুক হয়ে উঠে। অর্থাৎ 'অসামাজিকতা' বিশেষণের এই রুগি তখন আর্থসমাজকে নানান কাণ্ডে জ্বালাতন করতে থাকে!

অপক্ষমতার থেকে দূরে থাকতে চাওয়া মানুষ

এই অসামাজিকরা চলতি আর্থসমাজের মধ্যে রক্ষণকামী ক্ষমতাচক্র থেকে যে শান্তিপ্রিয় মানুষ একটু দূরে থাকতে চাইছে তার গায়েই 'অসামাজিকতার' সেই লেবেলটা সাঁটিয়ে দিচ্ছে।

এরা হল ক্ষমতার সেই অবশেষ যাদের কাছে ব্যক্তি জীবনের ব্যাকগ্রাউন্ড সাইডগ্রাউন্ড কোনোটিই ধর্তব্য থাকে না। হয় সেই দলের ক্ষমতাকে অথবা তার ব্যক্তি সেন্টিমেন্টকে তৃপ্ত করলেই তার কাছে তখন সাত খুন মাফ।

অস্তিত্ব বর্ণিত মনের সেই পাতলা আবরণ অর্থাৎ অবচেতনার ইন্ধনে এরা কোথায় যেতে পারে তা পূর্বে থেকে বলা মুশকিল। তবে পর পর কতগুলি অপকাণ্ড এরা করে যথাক্রমে--

১। নিন্দা- গঠনশীল মানুষের নিন্দা করা। তার বিরুদ্ধে নানান অপবাদ দেওয়া। অসামাজিক ইত্যাদি প্রচার চালানো।

২। চরিত্র হনন - এই করে করে গণমনে তার সম্পর্কিত বিরূপ ভাব জাগিয়ে তোলা। সেক্সের মত মুচমুচে বিষয় সামনে এনে যৌন অপবাদ দেওয়া। তার জন্য প্রয়োজনে নারীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা।

৩। প্রাণ হনন- এত কাণ্ড করেও যদি সে সফল না হয় তখন তার প্রাণ হানির চক্রান্ত করতেও সে পিছপা হয় না।

অনুশীলন পর্বে

ন্যায় চার্চিক মানুষ তাই মনের পাতলা আবরণের ইন্ধনকে প্রতিহত করে। জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রামের অস্ত্রে শান দেয়। নিজের নাগরিক মনন, রাজনৈতিক মনন ও সামাজিক মননকে সংহত করে। আর্থসামাজিক স্বর্গ রচনায় আশু এবং সুদূরপ্রসারী ভূমিকার রূপায়ন ঘটাতে থাকে।

এর জন্য সে প্রথম পদক্ষেপ নেয় জ্ঞান ক্ষেত্রে। তত্ত্ব চর্চা করে। তত্ত্ব আহরণ করে জীবনে প্রয়োগ করে। অস্তিত্ব বর্ণিত ফিল এণ্ড ওয়ার্ক, ওয়ার্ক এণ্ড ফিল (Work and Feel, Feel and work) তত্ত্বের বাস্তবায়ন করে।

শ্রীপঞ্চমী তত্ত্বঃ আর্থসমাজে নান্দনিক ভোগ প্রতিষ্ঠার সুদর্শন প্রজ্ঞা

শ্রীচেতনিক

ধারণা

মহা জ্ঞানগ্রন্থ আলকোরানের একটি কথা- "শুধুমাত্র ভুল ধারণা পোষণ করার কারণে আমি কোনো জাতিকে ধ্বংস করিনা"। এই কথাটির অর্থ হল ভুল ধারণার ইন্ধন দেয় রক্ষ। কিন্তু মানুষ সেই ভুল ধারণার খপ্পরে পড়লেও যে রক্ষের ইন্ধনে সেই ভুল ধারণা সে পোষণ করে তার প্রতি তার অনুভূতিগত ঘৃণা থাকে। ফলে সে তার থেকে দূরেই থাকে। অর্থাৎ সে ধ্বংস হয় না। ইমান অর্থাৎ বিশ্বাসের চর্চা করলে এরা রক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও পারে।

কিন্তু যে বা যারা রক্ষের ঢাকের বাঁয়া বা তার ঢাল হয়ে সেই সব ধারণার সংক্রমণ ছড়াতে থাকে তারা ঠিকই ধ্বংস হয়ে যায়। মানে নিয়মের বিরুদ্ধে গেলে সেই নিয়মেই সে বা তারা ধ্বংস হয়।

ধারণা-মোছা বিশ্বাস সঞ্চারণ

তাই প্রথম থেকেই প্রয়োজন ধারণা মুছে ফেলে বিশ্বাস সঞ্চারণ করা। আমিত্ব সচেতন হয়ে তা করা যায়। ধারণা বহু রকম বিশেষণে মানুষের উপর চেপে বসে। সব রকম ধারণার সংক্রমণ ঘটে মানুষের অতৈন্দ্রিক ধারণার আঁতুড় ঘর থেকে। 'অতৈন্দ্রিক ধারণা' মানে ইন্দ্রিয় অতিরিক্ত কোনো কিছু যা সমাজে 'অলৌকিক' বলেও পরিচিত। তাতে ঘুরপাক খাওয়া। আর্থসমাজে এই সব ধারণায় ঘুরপাক খায় না এমন মানুষ গুটি কয়েক। বেশির ভাগ মানুষ সেই জঙ্গলের জংলী।

শ্রীপঞ্চমী তত্ত্ব

এই ধারণা নিশ্চিহ্ন করে বিশ্বাস সঞ্চারণ ভূমিকা কী হতে পারে? সেই প্রসঙ্গেই এসে যায় শ্রীপঞ্চমী তত্ত্ব। অস্তিত্ব বর্ণিত প্রতিপাদ্যে এই তত্ত্বেই সেই কাঙ্খিত বিশ্বাস সঞ্চারণ ঘটতে পারে। বস্তু তত্ত্বের শ্রীপঞ্চমী আলোচনার আগে প্রয়োজন রক্ষের শ্রীপঞ্চমী সংক্রান্ত ধারণাটিকে জানা। সেটি কী?

শ্রীপঞ্চমী হল মাঘ মাসের শুক্লপঞ্চমী। সেই দিন সরস্বতী পূজার তিথি। যার অন্য নাম বসন্ত পঞ্চমী। এ হল আভিধানিক মিনিং। রক্ষণকামী সংক্রমণ লক্ষ্মী-গণেশ-সরস্বতী-কার্তিক-দুর্গা তত্ত্বে ধারণা-সংস্কারের সিলমোহরে আর্থসমাজকে মোহরান্ধ করেছে। কাজেই সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠানের তিথি রূপে শ্রীপঞ্চমী তত্ত্বকেও সে আনুষ্ঠানিক ফাঁদে বন্দি করবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

বস্তু নিরিখে শ্রীপঞ্চমী তত্ত্ব

১. পদক্ষেপক আমি অর্থাৎ আমিত্ব সচেতনা। অর্থাৎ অচেতন থেকে জেগে উঠে সচেতন হতে হয়। 'আমি' আছি এই উপলব্ধি আসে।

২. পদাঙ্কিত পদার্থ অর্থাৎ সচেতনায় অগ্রসর হওয়া মানে শ্রম প্রয়োগ করা। শ্রম প্রয়োগ করতে হয় প্রাকৃতিক পদার্থে। তাতে তা মানব ব্যবহার উপযোগী হয়। মূল্য সৃষ্টি হয়।

৩. পদাঙ্কনী শ্রমের অথমূর্ত অর্থনীতি অর্থাৎ শ্রম-শ্রমমূল্য-আবশ্যিক বা পুনরুৎপাদন মূল্য-উদবৃত্ত বা আর্থসামাজিক মূল্য অর্থাৎ একটি শব্দে অর্থনীতিকে জানা। জানা অর্থে জ্ঞান, অর্থে সংস্কৃতির চর্চা।

৪. অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণী ইতিহাস অর্থাৎ অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করার রাজনৈতিক কৃৎকলায় রাজনীতিক হয়ে ওঠা। সেই রাজনৈতিক কৃৎকলাতেই ইতিহাস সৃষ্টি হয়।

৫. সত্তা থেকে ঐতিহাসিক আমিত্ব নিষ্ক্রমণী প্রায়োগিক বর্তমান। অর্থাৎ সেই রাজনৈতিক কৃৎকলার বাস্তবায়ন বা সলাত কায়েম বা আমিত্বিক অধিষ্ঠিতি। আর এর আর্থসামাজিক পৃষ্ঠে আমিত্বিক প্রতিষ্ঠিতি।

এই পঞ্চপ্রযৌক্তিক চেতনাঙ্গমই শ্রীপঞ্চমী।

আর তার একসূত্রীয় অর্থাৎ অখণ্ড আমিত্ব-উপলব্ধি হল সুদর্শন। এই সুদর্শন বীক্ষণেই আমিত্ব স্পষ্ট, প্রযুক্তি নিঃসন্দেহ এবং ভোগ নান্দনিক।

নন্দনহীন জীবনের পরিণাম

নান্দনিক ভোগ বাস্তবায়িত না করতে পারলে মানব

চেতনা থেকে এষণা-বাসনা লুপ্ত হয়ে গিয়ে নিম্নতলী চেতনা কামধেনুর কামনায় কাতর হয়ে হয়ে যায় বিশ্বামিত্র অর্থাৎ জড়বন্ধু।

এই জড়বন্ধুত্বের ছলে বশিষ্ঠের নন্দিনীকে সে চুরি করতে যায়। কে এই নন্দিনী? এই নন্দিনী কেউ নয় নিজেরই অভীষ্ট সিদ্ধের কৃৎকলাময় আনন্দ অর্থাৎ নিজেরই আমিত্ব। নিম্নতলী সেই চেতনা জড়ের কাছে সরে গিয়ে নিজ আমিত্বকে বিস্মৃত ও প্রতারিত করে। ফলে সে আত্মকারাগারে বন্দি হয়। এই কারাবন্দি মানুষই বিভিন্ন সেকটারিয়ান ব্লকে ব্লকড হয়ে নানান অতৈন্দ্রিক ধারণায় আক্রান্ত হয়। যেমন নন্দিনী মানে কামধেনু অর্থে সেই অতৈন্দ্রিক গাভী, যেমন বোররাক মানে পাখাবিশিষ্ঠ অতৈন্দ্রিক পাখি কিম্বা সুরা বাকারায় বর্ণিত গাভীটি অনুরূপ কিছু!

এসবের তত্ত্ব ভেদ করে বস্তু উপলব্ধি এদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এরা আত্মবন্দিত্বে রক্ষের কারায় কুহকবন্দি। এদের কাছে আল্লাহ, ভগবান, বিশ্বাস মানে দুনিয়াদারি ধারণা জড়ানো অতৈন্দ্রিকতা।

কামনান্ধতার নেপথ্য

এই কামনান্ধতার নেপথ্যে কী? তা হল রক্ষেরই যৌন অবদমনী ইন্ধন। সাক্ষীসহ মন্ত্রপড়া হয়ে গেলেই যৌনতা বস্তুবাচক হয় না। তা বিকৃত হয়ে যায়। বিকৃত আর্থসমাজে যথাসময়ে যথাযোগ্য যৌন সঙ্গীর অভাবে সংক্রমণ আর সংক্রমণের অপঘটনা ঘটতে থাকে। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম।

শরৎচন্দ্র অনুভূত দেবদাস আর পারু মিলনহীনতা আর্থসমাজকে কোথায় নিয়ে যায়?

ঐ যে পাগল, খল-বন্ধু, প্রবঞ্চক নেতা, ঘুষখোর, ধর্ষক, ঐ যে লুম্পেন ছিনতাইকারী ওরা কারা?

এরাই আমিত্ব-প্রেমহীন জীবনের অনুর্বর পরিণাম! যা জড়-জীবনের অনিবার্য সঙ্গী অতৈন্দ্রিক ধারণা, আর জড় যৌনতার সংক্রামিত বিকৃত ফসল!

সুদর্শন প্রজ্ঞা

এই ভাবে বিকৃত হওয়া আর্থসমাজে কামনান্ধ মানুষ অখণ্ড বীক্ষণে কিছু দেখতে পায়? তার কোনো অখণ্ড বীক্ষণই তো নেই সে কী দেখবে? সে দেখবে তা-ই যা রক্ষ তাকে দেখায়। রক্ষ কী দেখায়? দেখায় ভাগ্য অর্থাৎ ভাগ ভাগ করা জীবন। এটি ব্যক্তি জীবন, এটি সমাজ জীবন, এটি অর্থনীতি, এটি কালচার, এটি দর্শন এটি বিজ্ঞান, এটি ধর্ম, এটি অধিবিদ্যা, এটি পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি প্রভৃতি। এগুলি সব পৃথক, কেউ কারো সাথে যুক্ত নয়। এই ভাবে রক্ষ মানুষকে বস্তু থেকে দূর ব্যবধিত করে দেয়। এরা বিভক্ত রক্ষণ মানসে রক্ষকে শনাক্ত করতে পারেনা। লড়াই তো দূর অস্ত!

শ্রীপঞ্চমীর প্রায়োগিক সেই সুদর্শন প্রজ্ঞাতেই তখন জীবনকে তার সমগ্রতায় ধরা যায়। সুদর্শন অর্থাৎ যা অমিত্বিক ইন্দ্রিয়ত্বের সূত্রকে ভেদ করতে পারে। তাতেই পরিদৃষ্ট হয় জীবনের সারবত্তা।

সমস্যা সংকট চিহ্নিত হয়। প্রশ্নমালা সহ উত্তর প্রযুক্তি অর্জন করে সমকালীন দ্বন্দ্ব-প্রায়োগিক দল। যাতে সংস্কৃতির শীলনে রাজনীতির ভ্যানগার্ড আর্থসমাজে আমিত্ব বিকাশেয় প্রেম বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা ঘটায়। ইতিহাস সৃষ্টি হয়।

সুদর্শন প্রজ্ঞায় জন্মাষ্টমী প্রযুক্তি বাস্তবায়িত হলে আর্থসমাজ যৌন অবদমনে ভোগে না। অস্তিত্বের যৌনবিজ্ঞান ম্যারেজ মেডিক্যাল বোর্ড বাস্তবতায় আর্থসমাজে অবদমনী অবাঞ্ছার প্রতিকার করে। জীবনের নান্দনিক ভোগ বাস্তবায়িত হয়।

গল্প

মৃন্ময়ী

কস্তুরী

মৃন্ময়ী স্কুল আর বাড়ির দায়বদ্ধতায় কিছুদিন থেকে প্রায় আধমরা হয়ে উঠেছে। নানান অসুখও বাসা বেঁধেছে তার শরীরে। অনির্বাণ প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করে। অবকাশ, অবসর খুবই কম। কোনো সময় দিতে পারে না ফ্যামিলিকে। সেও ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত। সেও চায় স্ত্রী কন্যার সাথে সময় কাটাতে। কর্পোরেটদের যাতাকলে শুষে নেয় প্রেম, ভালোবাসা, অবকাশ, অবসর। মৃন্ময়ীর শরীরের অবস্থা দেখে চিন্তিত হয় অনির্বাণ। রাত এগারোটা ছাড়া কোনোদিনই ফেরা হয় না তার।

ঘুমন্ত মেয়ে ঐন্দ্রিলার কপালে আলতো চুমু দিয়ে ডাকে – মৃন্ময়ী শুনছো? তোমাদের জন্য সারপ্রাইজ আছে। মৃন্ময়ী - বল, কী সারপ্রাইজ? অফিস থেকে বিমানের তিনটি টিকিট গিফট দিয়েছে। বিশাখাপত্তনম ভ্রমণের জন্য। মৃন্ময়ী - জীবনের অবকাশ, অবসর প্রেম ভালোবাসা ছিনিয়ে নেওয়ার বদলে এগুলো এক একটা উৎকোচ অনির্বাণ। অনির্বাণ - সে তুমি যাই বলো এই সুবাদে তোমাকে-ঐন্দ্রিলাকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে গেলে ভালোই লাগবে। তাছাড়া তুমি কতদিন বাড়ির বাইরে যাওনি বলতো। তোমার শরীর মন একটু হলেও হালকা হবে। চলো যাওয়া যাক। মৃন্ময়ী- বিশাখাপত্তনম থেকে চেন্নাই বেশি তো দূরে নয়। আমার হোল বডি চেক আপটা করে নেওয়া যাবে। অনির্বাণ - ঠিকই বলেছো, মৃন্ময়ী - সমস্ত প্যাকিং কমপ্লিট করে ফেলি তাহলে।

কয়েকদিন পরে।

মৃন্ময়ী-এখানকার ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন রিপোর্ট সব নিয়ে নিলাম, কেমন? অনির্বাণ - সন্ধ্যা ৭ টায় ফ্লাইট, বাড়ি থেকে বিমান বন্দর পৌঁছাতে মিনিমাম ছয় ঘন্টা সময় লাগবে।

হালকা ভাবে সেঁজেগুজে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মৃন্ময়ী। অনির্বাণ ঐন্দ্রিলাকে রেডি করে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো গাড়ি করে বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে।

এতটা পথ জার্নি করে শরীরটা খুব একটা ভালো নেই মৃন্ময়ীর। চুপচাপ বসে আছে ওয়েটিংরুমে। অনির্বাণ প্রয়োজনীয় চেকিং পর্ব মিটিয়ে ফেলে, মৃন্ময়ী ও ঐন্দ্রিলাকে নিয়ে ফ্লাইটে গিয়ে উঠলো।

মৃন্ময়ী প্রথম ফ্লাইটে চাপছে। তার ভেতরে কেমন একটা ভয় ভয় করছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। তাছাড়া এমনিতেই তার ভমিটিং ভাব আছে। যখন বিমানটি উড়তে শুরু করল তখন থেকে তার মাথা ঘুরতে আরম্ভ করল আর বমি পেতে লাগলো। এয়ার হোস্টেস এসে কয়েকটি প্যাকেট দিয়ে গেল এবং সহানুভূতির স্বরে বলে গেল ভয় পাবেন না ম্যাম ঠিক হয়ে যাবে। সেই মুখটা দেখে অভয় পেলেও বমি কিন্তু থামে না। সামনে বসা সিটে দুজন নরনারী। তথাকথিত সভ্য অভিজাত নারীটির আওয়াজ শোনা যায়– ছিঃ ছিঃ, কোথা থেকে এরা যে উঠে আসে! মৃন্ময়ী অবাক দৃষ্টিতে তাকায় নারীটির দিকে। অসুস্থ ঘোলাটে চোখ দুটি স্থির হয়ে যায়। এরাই সভ্য সমাজের প্রতিনিধি, এরাই অভিজাত। ভাবতে ভাবতে মিনিট পাঁচেক এর মধ্যে ল্যান্ড করে। ঐন্দ্রিলা মায়ের হাত ধরে মাকে আগলে নামতে থাকে।

অনির্বাণের অফিস থেকে হোটেল বুক করা ছিল। সেখানে গিয়ে রেস্ট নিয়ে স্নান সেরে মৃন্ময়ী শারীরিক ভাবে সুস্থ বোধ করে কিন্তু মনের মধ্যে সেই কাঁটাটা সবসময় বিঁধতে থাকে। খুব সকালে উঠে অনির্বাণ তাড়া দিতে থাকে আজকের স্পট ইয়ারাডা বীচ, দারুণ জায়গা। সত্যি অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য! পাহাড় আর সমুদ্র এক জায়গায় মিশে গেছে। সমুদ্রের রাশি রাশি ফেনিল ঢেউ এসে লাগছে পাহাড়ের গায়ে। সিক্ত হচ্ছে

প্রতিনিয়ত পাহাড়। অনির্বাণ ঐন্দ্রিলা উপভোগ করে জলরাশির খেলা। মৃন্ময়ী ধীর পায়ে হাঁটতে থাকে পাহাড়ি বসতিটির দিকে। সারা শহরটিকে ঘিরে রয়েছে পাহাড় আর সমুদ্র। পাহাড়ি বসতিতে মেয়েরা বহুদূর থেকে খাওয়ার জল আনছে মাথায় করে হাঁড়িতে একটার পর একটা সাজিয়ে। পাহাড়ি উপত্যকায় তাদের জীবনযাত্রা বর্ণময়। অনেকটা পথ একা একা হেঁটে পাহাড়ে উঠতে মৃন্ময়ী হাঁপিয়ে উঠে। মাথা ঘুরে পড়ে যায় এবং জ্ঞান হারায়। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুলে দেখে– মুলোর মতো দাঁত কুচকুচে কালো পরনে এক খণ্ড কাপড় জড়ানো নাকে নোলক এক পাহাড়ি নারীর কোলে মাথা। সে পরম মমতায় স্নেহের কোমল স্পর্শে চোখে মুখে জল দিয়ে মুছে দিচ্ছে তাঁর মুখ। সেই স্পর্শ অনুভাব করার জন্য জ্ঞান ফিরে পেয়েও মৃন্ময়ী আরও কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকে। তার শরীর মনের গ্লানি পরম কোমলতায় মুছে যেতে থাকে।

কালপুরুষ

বৈশালী রায় চৌধুরী

“ওই দেখ্ মা , কালপুরুষ। হাতে ধনুক নিয়ে শিকারী দাঁড়িয়ে আছে।”

–"কোথায় ', ও তো কতগুলো তারা, কোথায় শিকারী বাবা?

আহা কল্পনা দিয়ে জুড়ে দে না মা, চোখটা বন্ধ কর, মনের মধ্যে শুরু কর আঁকা। এবার চোখটা খোল, দেখতে পাবি। মনটাকে খুব কাছাকাছি নিয়ে যা কালপুরুষের, দেখ্ ওটাই খালি দেখবি।

" হ্যাঁ বাবা, দেখেছি"। "পাবিই তো তুই যে আমার অর্ধেক কল্পনা দিয়ে গড়া "।

"খেতে চল "। লোডশেডিং হয়ে গেলে খুব মজা ঈশানীর। বাবা তারা চেনায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চেনায়, লক্ষ্য লক্ষ্য আলোকবর্ষের কথা বলে বাবা।

আংশিক লকডাউনের রাতে আবার তারা দেখতে ছাদে ওঠে ঈশানী, প্রায় তিরিশ বছর পরে। পৃথিবী এখনও অসুস্থ। কবে যে সারবে? বড় দম বন্ধ লাগে আজকাল ঈশানীর। আজ সে অন্য শহরে অন্য কোনো ছাদে। আকাশটা একই রকম তো নেই। তারার সংখ্যা কি বেড়েছে? কালপুরুষ কই? ঐ তো, চোখ আলতো করে বন্ধ করে আবার খোলে ঈশানী। কালপুরুষ নয়, বাবা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে প্রচুর আশীর্বাদী পদ্ম।

“ভয় পাস না, মন খারাপ না, আমি আছি এখানে। কল্পনা নয়,সত্যি সত্যিই আছি” ।

শোকেস

সেলিনা খাতুন

মণিদীপা তার ৮ বছরের মেয়ে বিনির পড়ার টাইম বদলে দুপুরে করে দিয়েছে। সকালে তার স্কুল, মা পড়াতো রাতে। স্কেচ পেন দিয়ে গতকালের আঁকা বাড়িটাই আজ সে রঙ করার চেষ্টা করছে, ভাবছে,– মায়ের এমন আজগুবি বুদ্ধি কেন যে মাথায় আসে, উজান এখুনি খেলার জন্য তার খোঁজ করলো বলে... উজান তার জেঠুর ছেলে, তার সমবয়সী। সেও স্কুল থেকে ফিরে স্নান করে খেয়ে বিনির সাথে খেলবেই– কে ক্লাসে পড়া পারেনি, কে কী শাস্তি পেল,কোন কোন মজার খেলা সে আজ শিখেছে, ইত্যাদি সব না বললে পেটের মধ্যে সব যেন কেমন গিজ গিজ করে, দুপুরে ঘুম আসেনা। এ ব্যাপারটা মোটেও সহজ ব্যাপার না, উজান বিছানায় ছটফট করেছে বলে দুদিন আগেই মায়ের হাতে মার খেয়েছে। হিসি করবে বলে বিনি ওয়াশরুমের দিকে গেছে...কান পেতে আছে, নাহ, উজানের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছেনা।ওদিক থেকে মণিদীপার গলা– এই বিনি আর কতখন?

বিনি আবার স্কেচ পেন হাতে নিল, মা গম্ভীর গলায় বলল..এই বাড়ির চালাটার রঙ বাইরে বেরিয়ে গেছে, গাছের রঙটা যেন ঠিকঠাক হয়। বিনি হাল্কা পায়ের শব্দ অনুভব করে, তার হাতের গতি বেড়ে গেল।

বিনি বইপত্র ব্যাগে ঢোকাচ্ছে, সে সময় উজান ঘরে ঢুকতেই বিনি বলে–জানিস না পড়ার সময় ডিস্টার্ব করতে হয়না? উজান ছুটে উপরে চলে যায়।

এদিকে বিনি পাতা ফুল এটা ওটা দিয়ে কী একটা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

–উজান,আমার হটপটটা দেত, সন্ধ্যা বেলায় এই পিৎজাটা আমরা দুজনে খাব।

–না আমি পারব না। তুই একাই খেল। অনেক্ষণ অপেক্ষা করেছি এরপর আর কোন দিন করবো না।

–মা ছুটি না দিলে আমি কী করব,ভীতুর মত বাইরে দাঁড়িয়ে না থেকে মার কাছে গিয়ে বললেই পারতিস, কাকি বিনি কে ছুটি দাও। মা কি তোর কথা ফেলত?.তুই কেন খেলবিনা?

–এমনি।

বিনি অসহায়তার ভান করে বলে– আমরা এখানে একটা বাড়ি বানাব, কিন্তু এটা তো নিচু জায়গা, মাটি তুলতে হবে, জেসিবি দিয়ে আমি কি পারব? জেসিবির নাম শুনেই উজান বলল–

–পাগল কোথাকার, নিয়ে আয় তোর জেসিবি, আমি তুলে দেব,মেয়েরা কি জেসিবি চালাতে পারে? তবে–

–কেন? চালালেই পারে। আমার ক্লাসঘরের দেয়ালেই তো লেখা আছে ছেলে মেয়ে সব সমান!

–মোটেও না, কুস্তি করতে যেমন মাসল লাগে, দেখেছিস– উজান বিনি কে থতমত করে দেবার মত কিছু বলার আগেই তার মায়ের গলা,–উজান আয় ঘুমোবি –

–দেখলি তো, হল খেলা? উজান চলে যায়। মায়েদের এই এক সমস্যা, নিজেরাও ভাব করে না,আমাদের বেলায় ও বাগড়া দেয়। বিনি একা বসে ভাবতে থাকে। কয়েকদিন পর। বিনি চেঁচিয়ে নিমেষেই বাড়িময় তোলপাড় করে তুলল–উজান জুস খাবি আয়, বাপি (সুবির) জুস এনেছে। আয়, বাপি ডাকছে।

উজানের ঘরে–

–দেখছ মা, কেমন চেঁচাচ্ছে! এতে কি কারো পড়াশোনা হয়?

উজানের মা রেখা বলে– তোকে বলেছি না, পড়ার সময় কথা নয়।

এবার উজানের কাকি ডাক দেয়...উজান!

–এবার শুরু হল কাকির।

–যাবার জন্য তো ছটফট করছো, বেশ বুঝছি, যাও শুনে এস? উজান এক ছুটে বেরিয়ে আসে। বিনির বাপি বলে....বিনি দুটো গ্লাস নিয়ে এস র‍্যাক থেকে।

আমি, আমি যাব, না আমি যাব বলে দুজন তাড়াহুড়ো করে ছুটে গিয়ে গ্লাস আনার সময় উজানের হাত ফস্কে একটি ভেঙে যায়।

–দেখলি, তোকে বললাম আমি, আমি যাচ্ছি, তুই পারবিনা, তবুও, এবার তো মা বকবে আমাকে, বাপিকে। আমি বলে দেব তোর দোষ। উজান একটু চুপ করে গেছে। সুবির উজানকে চেপে ধরে বলে– ওগুলো বড্ড মটমটে, এমনি ভেঙে যায়।

–এই কথাটা আমি মাকেও বলি কাকু, খেলনা ভেঙে যাবে বলে শোকেসে ঢুকিয়ে সব তালা মারা!

সুবির– ভীষণ বাজে। হু তোর মাকে বলতে হচ্ছে,!

–না না আমার নাম করে বলোনা। তাছাড়া মায়ের কি বুদ্ধি আছে, ওই বার্থডেতে নানু যে বড় জেসিবিটা দিয়েছিল ওটাও মা ভিতরে রেখেছে। তুমিই বল, মাঠের জিনিস কেউ শোকেসে রাখে?

রাত্রি বেলা। উজানের মা গম্ভীর গলায় বলে –তোর ব্যবস্থা খুব শিগগিরই হচ্ছে, তুই কেন গ্লাস ভেঙেছিস? উজান ভাবে, সে তো ইচ্ছে করে ভাঙেনি। আসলে দোষটা তার কাকির। সে কেন মায়ের মত তালা দিয়ে রাখেনি? দশবার কান ধরে উঠবোস করার পর পুরো চার পাতা এক নাগাড়ে হাতের লেখা চলল। সে এতটা পারতোনা,একটা খুশির খবর ছিল–পরদিন থেকে অনেকদিন ছুটি, কত দিন কেউ জানে না। একটা অসুখকে জব্দ করতেই এই ব্যবস্থা। অসুখটা যতদিন থাকে তত দিন অনেক বেশিক্ষণ ধরে খেলা যাবে।

পরের দিন লকডাউন এই মজার শব্দটা নিয়ে বিনি আর উজান খুব হাসাহাসি করল, শিয়াল বাঘ, এটা ওটা দিয়ে অনেক গল্প বানালো, উজানের স্কেচপেনের হিসেব তার মায়ের কাছে কড়া নজরে থাকে। তার কথায়– কাজের জিনিস বাজে কাজে নষ্ট করতে হয়না। উজান তাই বিনির রঙ-পেন্সিল দিয়ে দেয়ালে স্কুল এঁকে আশেপাশে গাছপালা জঙ্গলে ভর্তি করে দিল –বিনি বলল, দারুণ আইডিয়া।

উজানের দুদিন বেশ কাটল। তবে আজ ফোনে তার মায়ের বলা কথাগুলো তার ভালো লাগছেনা–মা কী সব বলল! কয়েকটা নতুন জামা প্যান্ট লাগবে। রাইটারের নাম দেখে ঠিক ঠিক বই কিনতে, নতুন ব্রাশ –জামা প্যান্ট পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু বই তো তার নুতনই। সে জানে তিরিশ দিনে একমাস, তিন মাস মত ক্লাসের পরই ছুটিটা পড়ল। তবে কি তাকে মামার বাড়ি নতুন স্কুলে দেবে, সেটাও খারাপ না, ওখানে মায়ের শাসন তো থাকবেনা।

ইদানিং বিনির আর খেলে মন ভরে না। উজান লুকোচুরি ছাড়া কিছু খেলতেই চায় না। বিনির পেন্সিল, রঙ নিয়ে খালি চারটে পাঁচটা নদি আঁকে, একা একজন নৌকায় বসে, তারপর লম্বা রাস্তার পরে কালো রঙের স্কুল। বিনির মোটেও এসব ভাল লাগেনা। উজান একে তো তার কথা অনুযায়ী কিছুই করছেনা। বরং তার রঙগুলো এই কদিনে ছোট করে দিয়েছে। আজ উজান সুন্দর জামাকাপড় পরে যখন বিনির কাছে এল,বিনি অবাক হয়ে বলল, নতুন জামা?–না, শোকেসে ছিল,পুরোনো। নতুন স্কুলে যাচ্ছি। তোর জেসিবিটা শোকেসেই রাখিস, অনেক দিন পর পর আসব যখন খেলব, তালা দিয়ে রাখলে চাবি হারিয়ে যেতে পারে। উজানের এই কথাটায় পুরো সায় দিয়ে কথার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিন চারবার মাথা নাড়ায় বিনি। কত কী বলার ছিল, কত নতুন কিছু খেলার ছিল। এই অল্প সময়ে বিনি কিছু বলতেই পারছে না। উজান গাড়িতে ওঠার পর যতদূর চোখ যায় বিনি চেয়ে থাকতে থাকতে ভাবল, তার নতুন স্কেচ পেন্সিলটা সে যে ভেবেছিল শোকেসে রাখবে তার দরকার নেই। লকডাউনের খেলা সব মাটি হয়ে গেল। কবে যে স্কুল খুলবে বিনি ভেবে কোনো কুল করতে পারেনা।

রুস্তমের ব্যাগ

আব্দুল মোমিন

বেঁটে খাটো শ্যাম বর্ণের ঘোলাটে লাল-নীলচে চোখ পিটপিট করে দেখে কৃষক রুস্তম। গ্রাজুয়েট, রাজনৈতিক দলের নেতাদের ক্রীড়নক ছোটো ছেলের সহযোগিতায় ছোটো দুই ভাইকে ঠকিয়ে মায়ের জমি বেচার টাকা হাতিয়ে নেয় রুস্তম।

প্রথমে ভাগ চাষ করত। মায়ের টাকা হাতিয়ে ভাগ চাষের কিছু জমি কিনে নেয়। সারাদিন মাঠে থাকে , কাজ করে। তার চাষের জমির দুই পাশের জমিওয়ালার সঙ্গে আগাছা ফেলা এবং ফসল কাটা নিয়ে ঝামেলা লেগেই থাকে। তার জমির পরেই নিচু জায়গা আছে। সেটি একটি মরা নদি। কেবল বর্ষার সময় নদিতে জল থাকে। নদিতে পচানোর জন্য পাট জাগ দেয়। ঝড় বৃষ্টি হলেই সে নদির পাড় পাড় ঘুরে বেড়ায়। যদি কোনো জাগ নদির জলে ভেসে যায় তাহলে সেটা ধরে নিয়ে নিজের বলে ছাড়িয়ে নেয়। আবার কখনো কখনো অন্যের জাগ গোপনে ছাড়িয়ে নেয়।

এখন মোটামুটি বেশ টাকা জমিয়েছে।

বাড়িতে অসুস্থ সত্তর ঊর্ধ্ব লাঠি নির্ভর মা, স্ত্রী, দুই ছেলে ও ছেলেদের স্ত্রী। সমাজে কৃপণতা, চুরি আর টাকা তছরুপের জন্য বেশ পরিচিত রুস্তম। টাকা ছাড়া সে কিছু বোঝেনা।

শীতের দিন। রাত্রি 2 টার সময় হঠাৎ করিমের বাড়িতে আগুন! আগুন আগুন করে চেঁচাতে চেঁচাতে মানুষ বালতি নিয়ে আগুন নেভানোর জন্য দৌড়ে যাচ্ছে। চ্যাঁচানোর আওয়াজে বাড়িতে সবার প্রথমে রস্তমের ঘুম ভেঙে যায়। বাড়ির কাওকে না জাগিয়ে রুস্তম দলিল, টাকা, ব্যাঙ্কের এটিএম কার্ড ও পাস বুক সাদা প্লাস্টিকে ভরা গাঢ় লাল রঙের গামছায় মোড়া ব্যাগটি বগলে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ায়।

করিমের বাড়ির বিধ্বংসী আগুনের আলোয় মানুষ তার বগলের ব্যাগ দেখতে পাচ্ছে দেখে রুস্তম বগল থেকে ব্যাগটি নামিয়ে পেছন দিকে হাত করে লুকানোর চেষ্টা করে এবং রাস্তা থেকে সরে গাছের নিচে দাঁড়ায় যেখানে আগুনের আলো কম পৌঁছাচ্ছে।

মানুষের দৌড়াদৌড়ির শব্দে বাড়ির অন্যরা জেগে যায়। বাড়ি থেকে সকলেই বাইরে আসে। আগুন নেভানোতে অংশগ্রহণও করে।

আগুন নেভানোর পর সকলে বাড়ি ফিরে কিন্তু রুস্তম আসে না দেখে সকলেই উদ্বিগ্ন হয়। অনেকক্ষণ পর বাড়ির সকলের চেনা ব্যাগ হাতে নিয়ে রুস্তম বাড়ি ফিরে। তাই দেখে খেটে খাওয়া বড়ো ছেলে বাবাকে বকা দেয়, তুমি বালতি নিয়ে গিয়ে আগুন নিভাবে, তা না করে তুমি আমাদের না ডেকেই সম্পত্তির ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে গেছো। আমাদের যা হবে হোক তোমার ব্যাগ থাকলেই হল! ছোট ছেলে দাদা কে থামিয়ে বলে, চুপ তো বাবা কী করবে!

কিছু দিন যেতে না যেতেই রুস্তমের পায়ে ব্যথা শুরু হয়। সেই ব্যথাকে গুরুত্ব না দিয়ে রুস্তম নেঙচে নেঙচে খালি পায়ে হেঁটে বেড়ায়। মাটির তাপে আর বিশ্রাম না নেওয়ার কারণে ব্যথা আরো বেড়ে যায়। শুরু হয় কবিরাজি চিকিৎসা। রুস্তম শয্যাগত হয়ে পড়ে। ছোট ছেলের বাবার ঘরে যাতায়াত বেড়ে যায়। বড় ছেলে রুস্তমকে ভালো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু কৃপণ এবং অর্থলোভী রুস্তমের টাকা খরচের শক্তি না থাকার কারণে ভালো ডাক্তারের কাছে যায় না। টাকার কারণে প্রয়োজনীয় পথ্যও খায় না।

ব্যাগটি রুস্তম মাথার কাছে বিছানার তলে আগলে রাখে। শেষমেষ রুস্তম শীর্ণ হয়ে মারা যায়। শরীয়ত মেনে তাকে দাফন করা হয়। বড় ছেলে সবার পরিচিত ব্যাগটি খুঁজতে থাকে। কিন্তু ব্যাগটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যাগের কথা সবাইকে বলতেই ছোট ছেলে বলে তুই ব্যাগের পিছনেই পড়ে থাক। এদিকে বাবা মরেছে, তুই শোক পালন করবি না তো তুই ব্যাগের পেছনে পড়ে আছিস।

গুচ্ছ কবিতা

রঞ্জন পাড়ুই

প্রেম

জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই...
বলতে বলতে লোকটা ট্রামে কেটে মরে গেল!
সেই কবে!
কয়েক দশক পর জ্ঞান এখন বেজায় সস্তা
যখন খুশি পেতে পারেন বস্তা বস্তা
মাকড়শার জাল বানিয়ে দিচ্ছে খাস্তা খাস্তা,
খান, গিলুন, গেলান চিপ ভেরি চিপ!

খালি হৃদয়ে মুঠো মুঠো কাঁচা ডাটা
পড়ছে না এক্কেবারে ডাটায় ভাঁটা!
অতএব জ্ঞানের দারিদ্র ঘুঁচল এবার
প্রেম বহে আকাশে বাতাসে কী দুর্নিবার!
দেশে দেশে রাজারা প্রেমের ফেরিওয়ালা
নে কত নিবি এবার প্রেমের জ্বালা!

চিড়ে চ্যাপটা বুকে বড্ড শূন্যতা মেখে
মেঠো ইঁদুর আর কুয়াশা নিয়ে কাব্যির লোকটার কথা
রিকল দিল, হঠাৎ রোদ্দুরে দুপুর!
জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই...
তাই নেই শক্তি...
তাই নেই সংগ্রাম...
অতঃপর ফেরিওয়ালাদের প্রেম-জ্ঞান-ডাটার দুনিয়া
থেকে রেহাই দেবে কে?

এমনি সময়ে একদিন ইউরোপ থেকে একটা ক্ষ্যাপা
লোক নাইটিংগেল এর জগতে হারাতে চাইলেন!
পারেন নি! তাই অকাল মৃত্যু!
তখন জার্মান সেই শান্ত-সৌম্য গভীর চোখের লোকটা
বলবেন, অনেক ব্যাখ্যা হয়েছে!
পৃথিবীটা এবার পালটান!

মাকড়সার জাল ঘেঁটে জানার দরকার নেই, নিজের
জন্ম পরিচয় !
হৃদস্পন্দন আর ক্ষুরধার মস্তিষ্ক আবাহনে
ডাটা ফেরিওয়ালা নিক্ষিপ্ত হয় সাগরের জলে!
জ্ঞান মিতালি করে প্রেমে...
তারপর? সে এক অন্য পৃথিবীর গল্প!

(29 মার্চ, 2021)

'ব্র্যান্ড' বাবুর আবেদন

ত্রিশ ত্রিশ বছর ভর
অহল্যা কৃষির দেশে
'খেটে- খাওয়া-গরিব-মেহনতি' বক্তিমা একের পর এক...
ক্ষমতা কবজা, লোকাল-জোনাল-স্টেট মেশিনারি
অনুপম আর্ট!
আমার যে আর চলে না! শিল্প চাই!
চাই কাজ!
ব্র্যান্ডের খোঁজ অতঃপর
কম্বিং অপারেশনে তুমি পেলে
উপযুক্ত সাজ!
ব্র্যান্ড বুদ্ধ!
ব্যাস! কর্পোরেটের SEZ হাব
জমি চাই জমি, করবো শিল্প, হবো শুদ্ধ!

নামাও স্লোগান মাঠে, সম্মতিতে না হোক
করো জোর, লাল যে কখন সবুজ হয়ে যায়
এমনি করেই সিঙ্গুর নন্দিগ্রাম ফোক!
জমি বাঁচানোর সনাতন ঝোঁক তাতালো
আন্দোলন আন্দোলন! পুলিশ, গুলি কাঁদানে বন্দুক!
রক্ত, রক্ত, ডজন বেশি লাশ!
সাজোনো রাজপাট ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড করে গেল
তুমি হরিশ্চন্দ্র!

খড়কুটো জীবন বহেনা, বাবু সব ঘর বন্দি
ছোটলোকের ক্ষমতা দুয়ার ফন্দি!
আর কি সহ্য হয়!
হঠাৎ খবর ঝাঁকি মারে, যদি পাবলিক খায়!
'আন্দোলন নায়িকা'র ভোট বালাইয়ে
বিবৃতি তাই মহাসত্য হয়!
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল লাল আইটি সেল!
ব্র্যান্ড ইমেজের কালো, অপসৃত হয়ে গেল!

ওহ, ক্ষীণদৃষ্টি! আবারো করলে ভুল
পরে বোলো শিক্ষা নেবার কথা!
'কর্পোরেটের শিল্পায়ন দেয় না কাজ'
বোঝো নাকো এই ছোট্ট অঙ্কের কুল!

ভাইরাল মেসেজে ক্ষমা চাওয়া তোমাকে
আবার বিবৃতি ধরায় ওরা
বড় শত্রু ছাড়, ধরো ধরো ঘাস !
তাতেই অডিও বিবৃতির ঝাঁজ কেবল ঘাসে ভরা, পদ্ম
কোথায় বাবু 'সর্বহারা'!
কেবল একটি শব্দ ছাড়া!

ওরা ভোটের চেয়ে বেশি কিছু চায়
চায় তোমার দেহ-মন-আত্মা নিরঙ্কুশ!
এরাও চেয়েছিল তা-ই
আত্মার আত্মীয় কেন, বুঝে নিও ভা-ই!!

ভ্যাক্সিন

বিজ্ঞান বিজ্ঞান, ডাক্তার ডাক্তার
কেমন সব অসহায়, দেয় দেখ হাঁক তার!
এ বলে এইটা, ও বলে সেইটা
লোকগুলো ফুটবল, মারে কিক যে পারে যেইটা...
কোভিশিল্ড, মডার্না, কোভ্যাক নাম তার
কত কী, আজ নেয় টীকা তো কাল আসে কাল তার!

এলিট জন ভাবছে, ফাইজার নেবে ডোজ
সরকার দেয় না, কেন ছাই এত খোঁজ !
মার্চ গেলে ভেবেছিনু, এই বার বাঁচলাম
কীরে ভাই কী হল, ধুত্তোরি আবার যে কাশলাম!

ট্রেনে ট্রেনে ফেরি করা, লোকগুলো ভাবছে
কখন যে হুজুর লকডাউন টানছে!
কী করে কী হবে, সংসার যাত্রা
এত মার কেন দেব, একবারে মার না!

ভোটবাদ্দি বাজছে, সেইখানেও ভাবনা
যদি হয় বন্ধ, প্রচার-র‍্যালি জনসভা আর না!
তবে যে সাধের মন্ত্রী-সান্ত্রি, সব হবে ফক্কা
এর চেয়ে সেই ভাল, যাই যাক কিছু লোক অক্কা!

এরই মাঝে মরে বেঁচে ডাক্তার ডাক্তার
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান!
ডাক্তার বিজ্ঞান সব দেখে, কেবল
বার বার অজ্ঞান!!
(8 এপ্রিল, 2021)

গুলি চলছে!

তোমরা চাইছিলে না গুলি চলুক!
গুলি চলেছে! বাতাসে ভেসে চারটি প্রাণ মূক!
ক্ষমতা থেকে ছিটকে বেরোনো লোহা
বাংলার যে করেই হোক দখল চাই, স্ব-হা!

'আত্মরক্ষার্থ' তত্ত্ব নিয়ে হাজির ক্ষমতা স্তাবক
শেষ বিচার তো তাদের দেয় জনতা-চাবুক!

দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ খুব প্রয়োজন, ওঠ
সহস্র কণ্ঠ ব্যালটে জবাব, বাংলা থেকে দূর হঠ!

এরপরেও যদি তোমার ইউপি মডেল চায়,
সইতে শেখ সয়ে যাও, মরে বেঁচে টেঁসে যাও
তখন প্লেটো হেসে বলেন, বাহ! বেশ এই তো নাও!
(10 এপ্রিল, 2021)

মৃত্যু নয়, হত্যা!

তুমি হিসেব কষেই করেছিলে তাক
কারার অন্তরাল, অশীতিপর প্রৌঢ়
ক্ষমতার মৌচাকে ঢিল, মারে কেন বুড়ো
সি-হক!
তোমারও ছিল কত, কালো অ্যাপ্রোন ঢাকা দরবারি
বুড়ো!
সে ছিল না যে পোষ-মানা, তাই
খাবার খেতে একটি চুষ-কাঠিও নাই,
তার জন্য;
পক্ককেশ শামলা-বাবুদের কত হিসেব নিকেশ, নিক্তি-
ওজোন মাপ ;
এই তো কদিন আগের কথা!
তুমি তো ঠিকই জানতে, বুড়োটা ফিনিশ
ফিনিশ করো তাকে! কাজে লাগাও তোমার মেশিনারি!
মারো পচিয়ে জেল, ঘানি
আদালতি তারিখ এক দুই তিন
দিন যায়-রাত যায়, মাস-বছর সব যায়
এক ঘিনঘিনে বর্ষার গুমোট-ধরা দিনে, ওরা খবর দিল
সত্যিই ফিনিশ!
এইবার বুড়োটা মরেছে!
হাড় কি জুড়োলো তোমার, এইবার?
এখনও চুপ! আর কত নেবে?
ওহ, তোমার তো আছে লিস্টি
কে কে কথা বলে জল-জমি-জঙ্গল হিস্ট্রি
কে কে ভালবাসে জল-মানুষ, জমি-মানুষ
আর জঙ্গল-মানবের কৃষ্টি!
দাঁত-নখ ধার দাও যত পারো,
নিয়ে যাও একে একে আরও!
তবু জেনে রেখো,
তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে!
হাজার বছর আগে এই ভাষাতেই, তোমার মৃত্যু-বাণ
রচনা করেছিল আরেকটি বুড়া!
স্মৃতি কোষ কাজ করে, তোমার?
করবে না জানি, কুরুক্ষেত্র ছাড়া!

বেহ্যা

তুমি ফসলের ক্ষেতে মহামারি চাও
তুমি চাও বাগিচায় পঙ্গপাল
লোকে সেই কবে থেকে মেনেছে তোমার
চাওয়া
তুমি দেখেছ স্বপন রাশি রাশি ধন
মহামারির মহাসুযোগ
কীটনাশক ওষুধ বেচার ফাঁকতাল!
সব মেনেছি আমরা বহুকাল!

এবার তুমি মানুষের মহামারি চেয়েছ
রক্ত রক্ত লাশ লাশ পিপিই মাস্ক অক্সিজেন ভ্যাকসিন!
কত আইটেম, কত লাভ!
তোমার ভয় নেয় কোনও
এবারও মানবো জেনো!

ক'টি লোক চেঁচাবে চেঁচাক
আমাদের রক্তে সাড়ে তিন হাজার বছরের হিম!
জ্বলবে না টায়ার-বাস রাস্তা জ্যাম, নেতা বয়কট
তোমার ল্যাবরেটরি হবে না ঘেরাও
ভয় নেই কোনও
এবারো মানবো জেনো!

অক্সিজেনহীন হাঁপানিতেও হিম রক্ত উষ্ণ হবে নাকো,
আটঘাট মারা বামুন দাওয়াই জিষ্ণু!
তোমার পূর্বজ রেখেছে বানিয়ে তোমার প্রাণভোমরা
সিন্দুক ভরে
জাত-ভেদ আর স্বর্গ-নরক রেখেছে দাগিয়ে
ভয় নেই কোনও
এবারও মানবো জেনো!!

(27 এপ্রিল, 2021)

কোনো রোগ নেই

সব রোগ গেছে মুছে পৃথিবীর
খেয়েছে সব একটিই শূর-বীর,
করোনা!
নইলে দেখ জ্বর, জ্বালা সর্দি গর্মি কাশি
গলা বুক জ্বালা বদহজম কী সব ছাই একটাও কোনো
রোগ নয়, সিম্পটম করোনার!
ডাক্তার বদ্যি হাকিম কবিরাজ সব ফেল নাকি সব
পাশ!
অদ্ভুতুড়ে পোশাকে কত বুকের আশাটুকু শুষে নিচ্ছে,
প্রতিক্ষণ!
অক্সিজেন অক্সিজেন, এত অক্সিজেনহীন পৃথিবী, কবে
ছিল? কেমন সব আজগুবি লাগে!
ভ্যাকসিন এক ডোজ, অ্যাকটিভ স্প্রেডার
কাগজ লেখে– সুপার স্প্রেডার
কেউ জানে না! নন ভ্যাকসিনেটেড আক্রান্ত!
মরে যায় অজান্তে!
অতঃপর ভ্যাকসিনেশন আর দ্বিতীয় ঢেউ সম্পর্ক
পাচ্ছেন খুঁজে?
কনস্পিরেসি থিয়োরিস্টদের কথা বাদ দিন দিকি!
হাতে রইল কেবল অজ্ঞান!
না, না বিজ্ঞান নয়!

কাগজ লিখছে, ডাক্তাররা মানসিক অসুস্থ!
ওরা পিপিই পরে নাচে, ভ্যাঙায়
রোগ না কি রোগী মারে! কে জানে?

তবু এসবের শেষে কেবল রয়ে যায়
একশো হাজার 'জানিনা'!
দেখা যায় প্রযুক্তি-দম্ভের ঠুনকো
প্রত্যন্ত প্রদেশ!

এরই মাঝে রাজা তার হিসেব কষে
বণিক তার তার!
ওষুধের দোকানদার, সেও!
হিসেব আরো কিছু লোক কষতে বাধ্য হয়
তারা মাঠ-ঘাট-বন্দর-আর ট্রেনের লোক!

আমাদের ছা-পোষাদের দল বিত্ত নাকি মধ্য
মাসের শেষে মাইনেটা নিশ্চিত বলে সবচেয়ে ভীতিতে
দিন কাটে, বাঁচে মরে!
প্যানিক অ্যাটাক ঘন-ঘন!

কোনো রোগ তো নেই!
রোগ তো একটাই, ভয়!
কোরো না!

(10 মে, 2021)

রাবণের কান্না

পলিটিক্সের কান্না, কান্নার পলিটিক্স
এভাবেই চলে রাজপাট, কত ট্রিক্স
বিজ্ঞাপন চাই একটা, ঝকঝকে বিজ্ঞাপন
হুজুরে হাজির যারা, কর নগর তর্পণ
নইলে অবধারিত কারাবাস, চরিত্র বা প্রাণ হনন!
সাজাও মিডিয়া, গ্লিসারিন চোখে
সাজাও সেট, ক্যামেরা গ্রাফিক্স ঝকঝকে!
তুমি জানো, তুমি নগ্ন
হয়েছো ক্লিন্ন, তুমি ভগ্ন!
প্রযুক্তি-পারিষদ দিয়েছে শলা আনকোরা
আবেগী তর্পণেই কাটতে পারে এ খরা!
তাইতে তোমার এ হিসেবি অশ্রু কণা
কতশত বেহিসেবি প্রাণের দামে কেনা!

পবিত্র জলধারা কোন পাপে করে যাপন
আজ পুঁতিগন্ধময়, ভেবেছ রবে গোপন!
বাতাস, জলধারা সকল প্রতিবেশ
বিষাক্ত বিবিমিষা, এ পাপের চাও শেষ?

চলো মনের মোষ ধরি, বনের মোষ পরুক সে
রাজবেশ, হবে নিঃশেষ!
(24 মে, 2021)

প্রেম-হীন

রোগ, রোগের কত নাম!
মস্তিষ্কের খরা, হৃদয়ের পুষ্টিহীন উষরতা কী রোগ?
ডাক্তার, জানেন?
জানেন না কারণ হৃদয় ব্যাপারটি একটি চৌকো বাক্স
ছাড়া অন্যকিছু নয়-
জড়-অ্যাকাডেমি তোতা-শিক্ষার এই গজ দিয়েছে
বহুকাল!
অতএব ডাক্তার বাদ গেল!
মনোবিদ?
মনোবিদ একই কারখানা থেকে এলেন
মাথায় সেই গজ গজ– রাসায়নিক 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া'
মনরূপে কল্পিত!
বেচারা কবি! যান কোথা?
ফিরে আসেন, নিজের কাছে আপন ঘরে
চেতনার সন্নিকট!
হৃদয়-মন-চেতনার সমীকরণ জড়ের কাছে নেই!
মহাকবি তুমিই বল, উষরতা কেন?
ব্যাসদেব অতি সহজেই উত্তর দিলেন– ভালবাসার
বস্তুতে 'আমি' সমর্পিত অর্ঘ্য দিতে পারার ব্যর্থতা!
(4 জুন, 2021)

স্মরণিকা, কমরেড!

তুমি ভুলে গেছ হলোকাস্ট, নাজি কনসেন্ট্রেশন
মনে করো, মনে করো কমরেড, কোরোনা ফ্রাসট্রেশন
মিউনিখের ক্ষুধা-বেকারি-অসম্মান গ্রেট ডিপ্রেশন
পৃথিবীর গভীর অসুখে মূঢ় অপ্রেশন
অমাবস্যা চিরে কালো আকাশ থেকে নেমে আসে ভাগ্যান্বেষী
নাগিনীর লোলজিভ ছুরি, মায়াবী অসত্যে বচন ছদ্মবেশী
করে ডিকলেয়ার, স্বপ্ন ফেরি ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল!
মূঢ় গণ গায়ে মাখে আকণ্ঠ ঢেকে যায়, বোধ-বিচার প্রজ্জ্বল!
সেই খানে তুমিও ছিলে নাকি বন্ধু, আপন স্কিম মগ্ন
ছিল তোমার সতিনও, সোশ্যাল ডেমোক্রাট ঘৃণ্য-ক্লিন্ন ভগ্ন,
তোমার চোখে। ইতিহাস দেখেছে সে রঙ্গ!
স্কিম ব্যর্থতায় সতিন শত্রু হল তীব্র
ছদ্মবেশীর সামনে ফাঁকা মাঠ গোলপোস্ট অরক্ষিত শূন্য
চারদিকে রণভেরি ফুয়েরার! ফুয়েরার! ষোলো আনা পূর্ণ
ইউরোপের আকাশে তারপর কেবলই শকুন আর পচা লাশ
একদিকে গ্যাস চেম্বার, রণাঙ্গন অন্যদিক, শুধুই বিনাশ !
আট-হাতা রাক্ষস, শেষে কাটে নিজ মস্তক
মানবতার পিঠে বুকে বিরাট ক্ষত, আজও দেয় দস্তক!
মিলিয়ন মিলিয়ন আলোর রেখা মিলিয়ে গেছে নিমেষেই
জার্মান হলোকাস্ট, এই তো সেদিন এই আকাশেই
একুশের আকাশে আজ আবার এই জমিনে লোলুপ শকুন
সেট রেডি, সেই তুমি-সেই সতিন, লাইট-ক্যামেরা একশন!

প্রেম ও প্রতিবাদ

দারিদ্র্য আর বৈভবের মাঝখানের বাঁচা-মরা
বড্ড আলাদা যে,
প্রতি বছরের কলেজ পাশ, প্রেমিক-প্রেমিকার সংখ্যা চলে বেড়ে
তার চেয়ে বেশি বাড়ে প্যাশন,
নিবৃত্তিহীন শরীর জুড়ে!
কী করা, কী করা, একটা কাজ চায়,
যেকোনো একটা কাজ!
শহর বড় নিষ্ঠুর-নৃশংস!
গ্রাম, সে কি কম?

ছেলে-মেয়েগুলি কোথা যায়?
সে ডাকাতদের চাঁদা পায়নি বলে ছেলে-মেয়েদের থেকে টাকা চায়!
বুকে চেপে পার্কের ঘেসো জংলায় যেতে পারেনা, তাও করেছে বন্ধ!

ব্যঙ্গের দেতো হাসির কিড়মিড় ছেড়ে
গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে
মাঠের পর মাঠ, সূর্যের দিকে সটান চোখ রেখে
একটা মিছিল দৃপ্ত এগোয়, সোজা রাস্তা!
উঁচু নীল বাড়িটার দিকে এগোতে থাকে!
কবি দিবা-স্বপ্ন দেখতে থাকেন!
তা তিনি দেখুন,
কিন্তু ৩৬ জন বুড়ো কেন এখনো গরাদ-বন্ধ?
প্রশ্নটি প্রেমিক-প্রেমিকা না করলে,
স্বপ্নের মিছিল মাটির সোঁদা-গন্ধে ভেজে কি, কবি?

(25 জুন, 2021)

ইঁট ও পাটকেল

সে দেশজুড়ে এলোপাথাড়ি ছুঁড়ে যাচ্ছে একের পর এক ইঁট
সামনে ঢাল নিয়ে দাঁড়ায় কেউ নেই
কেবলই ফাঁকা মাঠ
কখনও ধেয়ে আসে জাতীয় নিরাপত্তা
কখনও বা ব্ল্যাক মানি
কখনও বিশ্বগুরু হবার বাসনা
কখনও সিডিশন আরবান নকশাল গুলতানি!

দু একজন সাবেকি পালোয়ান মিহি সুরে গণতন্ত্র বিধানের দোহাই দিয়েছিল শুধু
অমনি কয়েকটি প্রদেশ হাতছাড়া
নতুন ইঁট ঘোড়া কেনার খেলা!
তোমরা চ্যাঁচাও বিধান বিধান বলে
সে লাঠায় রাজ্যে পাল দেয় তুলে,
কোথাও আরিফ মহম্মদ, কোথাও বা খড়ের ধন দেয় ঝুলিয়ে!

এদিকে মহামারিকে গুল মারতে গিয়ে
পালটা গুল খেয়ে কিছুটা বেসামাল সে
তুমি ভাবছিলে!
কিন্তু আবার নয়া ইঁট – অক্সিজেন প্রতিষেধকে
জিএসটি হানা!
পেট্রোল চাবুক কিংবা রান্নার গ্যাস!

মিহি লিবারেল, মোটা লিবারেল, সরু বাম, মোটা বাম
অতিবাম, কচি বাম
কত নামে বিধান বিধান চিল্লানি!
ফুঁৎকারে সে হাঁক ছাড়ে...
থামাও বকুনি, লাভ নেই কোনও!

পূবে চোখ পড়েছিল কতকাল, ছিল ক্ষুধা
শ্যেন চোখে বানিয়া মেপেছিল জল-জমি
আরও কত কী
সব দানে পেতে বাজি রেখেছিল!
বাঙালির সপাটে কষাঘাত খেয়ে মরিয়া আক্রমণ
বারে বারে হানে এখনও!

বিধি কিংবা পরিণামী বিধান
পাটকেল হাতে খাড়া করে দেয়
সেমি-পালোয়ান!
ইঁট ইঁট খেলা, এইবার বুঝ ঠেলা
ইঁটের সামনে শাস্ত্র পাঠে করেছিলে অট্টহাস!
এইবার একই অস্ত্র, একই চাল
প্রতিরোধ কর পাটকেল!
প্রদেশ পাওনি, হয়নি জিত , হারাতে রেডি হও লোক-লস্কর শেষ সম্বল!

(13 জুন, 2021)

পুনঃপাঠ

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন খবর পাই, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ মত কী তা আমার রচনা থেকে কেউ উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন, তখন নিশ্চিত জানি, আমার মতের সঙ্গে তাঁর নিজের মত মিশ্রিত হবে। দলিলের সাক্ষ্যের সঙ্গে উকিলের ব্যাখ্যা জড়িত হয়ে যে-জিনিসটা দাঁড়ায় সেটাকে প্রমাণ বলে গণ্য করা চলে না। কেননা অন্য পক্ষের উকিলও সেই একই দলিলকে বিপরীত কথা বলিয়ে থাকেন; তার কারণ, বাছাই-করা বাক্যের বিশেষ অর্থ নির্ভর করে বিশেষরূপে বাছাই করার উপরেই।

রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আমার মত আলোচনা করে সম্প্রতি ইংরেজি ভাষায় একখানি বই লেখা হয়েছে। ব্যক্তিগত দিক থেকে আমি লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ; তিনি আমার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন নি, শ্রদ্ধা করেই লিখেছেন। আমার প্রতি তাঁর মনের অনুকূল ভাব থাকাতেই আমার মতকে অনেক অংশে প্রচলিত মতের অনুকূল করে সাজিয়ে আমাকে সাধারণের প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।

বইখানি আমাকে পড়তে হল। কেননা আমার রাষ্ট্রনৈতিক মত কোনো পাঠকের কাছে কিরকম প্রতীত হয়েছে তা জানবার কৌতূহল সামলাতে পারি নি। আমি জানি, আমার মত ঠিক যে কী তা সংগ্রহ করা সহজ নয়। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্য রচনা করা আমার স্বভাব সেইজন্যে যখন যা মনে এসেছে তখনি তা প্রকাশ করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সেই-সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত। যেমন এ কথা বলা চলে না যে, ব্রাহ্মণ আদি চারিবর্ণ সৃষ্টির আদিকালেই ব্রহ্মার মুখ থেকে পরিপূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন স্বীকার করতেই হবে আর্যজাতির সমাজে বর্ণভেদের প্রথা কালে কালে নানা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে পরিণত, তেমনি করেই অন্তত আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোনটা তৎসাময়িক, কোনটা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।

বইখানি পড়ে আমি নিজের মতের ঠিক চেহারাটা পেলুম না। মন বাধা পেল। বাধা পাবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা কারণ এই যে, এর মধ্যে অনেক তর্জমা আছে যার ভাষা আমার নয়, অথচ আমার যে নয় তার নিদর্শন নেই। ভাষার ইঙ্গিত অনেকখানি কথা কয়। সেটা যখন বাদ পড়ে তখন কথার অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা মারা পড়ে। আর যাই হোক, নিজের ভাষার দায়িত্ব নিজেকে নিতেই হয় কিন্তু অন্যের ভাষার দায়িত্ব নেওয়া চলে না।

তবু এই ত্রুটিকেও উপেক্ষা করা চলে– কিন্তু এ কথা বলতেই হল যে, নানা লেখা থেকে বাক্য চয়ন করে আমার মতের যে একটা মূর্তি দেওয়া হয়েছে তাতে

অংশত হয় তো সব কথাই আছে কিন্তু সমগ্রত মোট কথাটা প্রকাশ পায় নি। এরকম হওয়াটা বোধ করি অবশ্যম্ভাবী। কোন্ কথাটার গুরুত্ব বেশি কোনটার কম, লেখক সেটা স্বভাবত নিজের অভিমত ও রুচির দ্বারা স্থির করেন এবং সেই ভাবেই সমস্তটাকে গড়ে তোলেন।

এই উপলক্ষ্যে আমার সমস্ত চিন্তার ক্ষেত্রের উপর নিজেকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করতে হল। রাষ্ট্রিক সমস্যা সম্বন্ধে আমি কী ভেবেছি কী বলতে চেয়েছি তা নিজেই কুড়িয়ে এনে সংক্ষেপে আঁটি বাঁধবার চেষ্টা করা ভালো মনে করি। এজন্যে দলিল ঘাঁটব না, নিজের স্মৃতির উপরিতলে স্পষ্ট হয়ে যা জেগে আছে তারই অনুসরণ করব।

বালককালের অনেক প্রভাব জীবনপথে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে; প্রত্যক্ষ না থাকলেও তাদের প্রণোদনা থেকে যায়। আমাদের ব্রাহ্ম-পরিবার আধুনিক হিন্দুসমাজের বাহ্য আচার-বিচার ক্রিয়া-কর্মের নানা আবশ্যিক বন্ধন থেকে বিযুক্ত ছিল। আমার বিশ্বাস, সেই কিছু-পরিমাণ দূরত্ব-বশতই ভারতবর্ষের সর্বজনীন সর্বকালীন আদর্শের প্রতি আমার গুরুজনদের শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত প্রবল। সেই গৌরববোধ সেদিন নানা আকারে আমাদের বাড়ির অন্তঃপ্রকৃতি ও বাইরের ব্যবহারকে অধিকার করেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের প্রতি যাঁদের আস্থা বিচলিত হ'ত, তাঁদের মনকে হয় য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ ছাঁদের নাস্তিকতা অথবা খৃস্টান-ধর্ম-প্রবণতা পেয়ে বসত। কিন্তু এ কথা সকলের জানা যে, সেকালে আমাদের পরিবারে ভারতেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ করে ভারতের ধর্ম সংস্কার করবার উৎসাহ সর্বদা জাগ্রত ছিল।

বলা বাহুল্য, বালককালে স্বভাবতই সেই উৎসাহ আমার মনকে একটি বিশেষ ভাবে দীক্ষিত করেছে।

সেই ভাবটি এই যে, জীবনের যা কিছু মহত্তম দান তার পূর্ণ বিকাশ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য থেকেই। আমাদের স্বভাবসীমার বাইরে শ্রেষ্ঠ জিনিসের অভাব নেই, লোভনীয় পদার্থ অনেক আছে, সে-সমস্তকে আমরা গ্রহণ করতে পারি নে যদি না আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তাদের আত্মসাৎ করি। যখন আমরা বাইরের কিছুতে মুগ্ধ হই তখন লুব্ধ মন অনুকরণের মরীচিকা বিস্তারের দ্বারা তাকে নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়। অনুকরণ প্রায় অতিকরণে পৌঁছয়; তাতে রঙ চড়াই বেশি, তার আওয়াজ হয় প্রবল, তার আস্ফালন হয় অত্যুগ্র; অত্যন্ত জোর করে নিজের কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করি জিনিসটা আমারই, অথচ নানা দিক থেকে তার ভঙ্গুরতা তার আত্মবিরোধ প্রকাশ পেতে থাকে। বাইরের জিনিসকে যখন আপন অন্তরের করি তখন তার ভাবটা বজায় থাকতে পারে তবু তার প্রকাশটা হয় নিজের মতো। কিন্তু যতক্ষণ সেটা আমাদের বাইরে জোড়া থাকে, ভিতরে মিলে না যায়, ততক্ষণ সেটা হয় মোটা কলমে দাগাবোলানো অক্ষরের মতো, মূলের চেয়ে আকারে বড়ো, কিন্তু একেবারে তার গায়ে গায় সংলগ্ন। তার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সে-অক্ষর লেখকের আপন বাক্যে লেখকের আপন চিন্তিত ভাবকে লিপিবদ্ধ করতে পারে না। আমাদের রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় বাইরে থেকে, ইস্কুলে পড়ার বই থেকে, আমরা যা পেয়েছি তা আমাদের প্রাণে সর্বাঙ্গীন হয়ে ওঠে নি ব'লেই অনেক সময় তার বাইরের ছাঁদটাকেই খুব আড়ম্বরের সঙ্গে রেখায় রেখায় মেলাবার গলদঘর্ম চেষ্টা করি– এবং সেই মিলটুকু ঘটিয়েই মনে করি, যা পাবার তা পেয়েছি, যা করবার তা করা হল।

'সাধনা' পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি। তাতে আমি এই কথাটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি। তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গবর্মেন্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতেম। আমাদের দেশে পোলিটিকাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনের তরুণেরা ঠিকমতো কল্পনা করতেই পারবেন না। তখনকার পলিটিক্সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মিলনীতে, গ্রাম্যজনমণ্ডলীসভাতে, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারতেন না। রাজসাহী-সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে

চক্রান্ত করে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি, তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন। বিদ্রূপ ও বাধা আমার জীবনের সকল কর্মেই আমি প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছি, এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। পর বৎসরে রুগ্নশরীর নিয়ে ঢাকা-কন্‌ফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষ্যে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্‌যোগ করেছি। বাঙালির ছেলের পক্ষে যে গালি সবচেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানি নে। এত বড়ো দুঃসহ লাঞ্ছনা আমি নীরবে সহ্য করেছিলুম তার একটা কারণ, ইংরেজি ভাষা-শিক্ষার বাল্যকাল থেকে আমি সত্যই অবহেলা করেছি; দ্বিতীয় কারণ, পিতৃদেবের শাসনে তখনকার দিনেও আমাদের পরিবারে পরস্পর পত্র লেখা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজিভাষা ব্যবহার অপমানজনক বলে গণ্য হ□ত।

ইতিমধ্যে কার্জন লাটের হুকুমে দিল্লির দরবারের উদ্‌যোগ হল। তখন রাজশাসনের তর্জন স্বীকার করেও আমি তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম। সেই প্রবন্ধ যদি হাল আমলের পাঠকেরা পড়ে দেখেন তবে দেখবেন, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক সম্বন্ধের বেদনা ও অপমানটা যে কোথায় আমার সেই লেখায় কতকটা প্রকাশ করেছি। আমি এই বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিসটা প্রাচ্য; পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়। প্রাচ্য অনুষ্ঠানের প্রাচ্যতা কিসে। সে হচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ স্বীকার করা। তরবারির জোরে প্রতাপের যে সম্বন্ধ সে হল বিরুদ্ধ সম্বন্ধ, আর প্রভূত দাক্ষিণ্যের দ্বারা যে-সম্বন্ধ সেইটেই নিকটের। দরবারে সম্রাট আপন অজস্র ঔদার্য প্রকাশ করবার উপলক্ষ্য পেতেন– সেদিন তাঁর দ্বার অবারিত, তাঁর দান অপরিমিত। পাশ্চাত্য নকল দরবারে সেই দিকটাতে কঠিন কৃপণতা, সেখানে জনসাধারণের স্থান সংকীর্ণ, পাহারাওয়ালার অস্ত্রে শস্ত্রে রাজপুরুষদের সংশয়বুদ্ধি কণ্টকিত, তার উপরে এই দরবারের ব্যয় বহনের ভার দরবারের অতিথিদেরই 'পরে। কেবলমাত্র নতমস্তকে রাজার প্রতাপকে স্বীকার করবার জন্যেই এই দরবার। উৎসবের সমারোহ দ্বারা পরস্পরের সম্বন্ধের অন্তর্নিহিত অপমানকেই আড়ম্বর করে বাইরে প্রকাশ করা হয়। এই কৃত্রিম হৃদয়হীন আড়ম্বরে প্রাচ্যহৃদয় অভিভূত হতে পারে, এমন কথা চিন্তা করার মধ্যেও অবিমিশ্র ঔদ্ধত্য এবং প্রজার প্রতি অপমান। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভুত্ব তার আইনে, তার মন্ত্রগৃহে, তার শাসনতন্ত্রে ব্যাপ্তভাবে আছে কিন্তু সেইটেকে উৎসবের আকার দিয়ে উৎকট করে তোলার কোনো প্রয়োজন মাত্রই নেই।

বরঞ্চ এইরকম কৃত্রিম উৎসবে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দেওয়া হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ খুব কঠিন হয়ে আছে কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের মানবসম্বন্ধ নেই, যান্ত্রিক সম্বন্ধ। এ দেশের সঙ্গে তার লাভের যোগ আছে, ব্যবহারের যোগ আছে, হৃদয়ের যোগ নেই। কর্তব্যের জালে দেশ আবৃত, সেই কর্তব্যের নৈপুণ্য এবং উপকারিতা স্বীকার করলেও আমাদের মানবপ্রকৃতি স্বভাবতই সেই প্রাণহীন শাসনতন্ত্রে পীড়া বোধ করে।

এই বেদনাই মনে নিয়ে আমার লেখায় আমি বিশেষ করে এবং বার বার করে বলেছি যে, ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকলপ্রকার হিতকর দান কোনো একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়েই চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়, তা হলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাক্, তার চেয়ে দুর্গতি আমাদের আর হতেই পারে না। সরকারবাহাদুর নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাবনিবারণের আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই, এইরকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হতে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে নিজে যথার্থভাবে হারাই। আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয় নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে, এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে, যে-দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার

দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি; একে অধিকার করতে পারি নি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি; তারই 'পরে অন্যায় আমরা মরে গেলেও সহ্য করতে পারি নে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশ পরাধীন বলেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এমন কথা শোনবার যোগ্য নয়। সত্যকার প্রেম অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই সেবার ভিতর দিয়ে স্বতই আত্মত্যাগ করতে উদ্যত হয়। বাধা পেলে তার উদ্যম বাড়ে বই কমে না। আমরা কন্‌গ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি, কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করি নি। কেবলই নিজেকে এবং অন্যকে এই বলেই ভোলাই যে, যেদিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এমনি করে কর্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রাখা, অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা করা, নিরুৎসুক নিরুদ্যম দুর্বল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।

আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে কেউই কেড়ে নিতে পারে না, এবং সেই দেশকে বাইরে থেকে দয়া করে কেউ আমাদের হাতে তুলে দেবে এমন শক্তি কারো নেই। দেশের 'পরে নিজের স্বাভাবিক অধিকারকে যে পরিমাণে আমরা ত্যাগ করেছি সেই পরিমাণেই অন্যে তাকে অধিকার করেছে। এই চিন্তা করেই একদিন আমি 'স্বদেশী সমাজ' নাম দিয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলুম। তার মর্মকথাটা আর-একবার সংক্ষেপে বলবার প্রয়োজন আছে।

চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা; গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের উপর দিয়ে রাজ্য-সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজায় রাজায় নিয়তই রাজত্ব নিয়ে হাত ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন-কাড়াকাড়ি করতে লাগল– লুঠপাট অত্যাচারও কম হল না– কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে, তার অন্নবস্ত্র ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের, রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে– তার কারণ, সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।

পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল রাজশাসন তাকে অধিকার করলে। যখন থেকে এই অধিকার পাকা হয়ে উঠল তখন থেকে গ্রামে গ্রামে দিঘিতে গেল জল শুকিয়ে; জীর্ণ মন্দিরে শূন্য অতিথিশালায় উঠল অশথ গাছ, জাল-জালিয়াতি মিথ্যা -মকদ্দমাকে বাধা দেবার কিছু রইল না; রোগে তাপে দৈন্যে অজ্ঞানে অধর্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেল।

সকলের চেয়ে বিপদ হল এই যে, দেশ দেশের লোকের কাছে কিছু চাইলে আর সাড়া পায় না। জলদান অন্নদান বিদ্যাদান সমস্তই সরকারবাহাদুরের মুখ তাকিয়ে। এইখানেই দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে। দেশের লোকের সঙ্গে দেশ যথার্থভাবে সেবার সম্বন্ধসূত্রে যুক্ত, সেইখানেই ঘটেছে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ। আগে স্বরাজ পেলে তবে সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলতে থাকবে এ কথা বলাও যা আর আগে ধন লাভ হবে তার পরে ছেলে মাকে স্বীকার করবে এ কথা বলাও তাই। দারিদ্র্যের মধ্যেও

স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলা উচিত– বস্তুত সেই অবস্থায় সম্বন্ধের দাবি বাড়ে বই কমে না। স্বদেশী সমাজে তাই আমি বলেছিলুম, ইংরেজ আমাদের রাজা কিম্বা আর-কেউ আমাদের রাজা এই কথাটা নিয়ে বকাবকি করে সময় নষ্ট না ক'রে সেবার দ্বারা ত্যাগের দ্বারা নিজের দেশকে নিজে সত্যভাবে অধিকার করবার চেষ্টা সর্বাগ্রে করতে হবে। দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে কেমন করে দেশে বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে স্বদেশী সমাজে আমি তারই আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলুম। খদ্দর-পরা দেশই যে সমগ্র দেশের সম্পূর্ণ আদর্শ এ কথা আমি কোনোমতেই মানতে পারি নে; যখন দেশের আত্মা সজাগ ছিল তখন সে যে কেবলমাত্র আপন তাঁতে বোনা কাপড় আপনি পরেছে তা নয়, তখন তার সমাজে তার বহুধা শক্তি বিচিত্র সৃষ্টিতে আপনাকে সার্থক করেছে। আজ সমগ্রভাবেই সেই শক্তির দৈন্য ঘটেছে, কেবলমাত্র চরকায় সুতো কাটবার শক্তির দৈন্য নয়।

আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা, এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে-আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহ্য প্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন; সে কি এই চরকা-চালনা। চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এতকাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে কর্মকে আড়ষ্ট করে রাখি নি। আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণ কি তাই নয়। আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, বিদ্যা চাই নে, প্রীতি চাই নে, পৌরুষ চাই নে, অন্তর-প্রকৃতির মুক্তি চাই নে, সকলের চেয়ে বড়ো ক'রে একমাত্র ক'রে চাই চোখ বুজে মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন চালানো হয়েছিল তারই অনুবর্তন করে। স্বরাজ-সাধন-যাত্রায় এই হল রাজপথ? এমন কথা বলে মানুষকে কি অপমান করা হয় না।

বস্তুত যখন সমগ্রভাবে দেশের বুদ্ধিশক্তি কর্মশক্তি উদ্যত থাকে তখন অন্য দেশ থেকে কাপড় কিনে পরলেও স্বরাজের মূলে আঘাত লাগে না। গাছের গোড়ায় বিদেশী সার দিলেই গাছ বিদেশী হয় না, যে মাটি তার স্বদেশী তার মূলগত প্রাধান্য থাকলে ভাবনা নেই। পৃথিবীতে স্বরাজী এমন কোনো দেশই নেই যেখানে অন্য দেশের আমদানি জিনিস বহুল পরিমাণে ব্যবহার না করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তারা নানা চেষ্টায় আপন শক্তিকেও সার্থক করছে– কেবল এক দিকে নয়, কেবল বণিকের মত পণ্য উৎপাদনে নয়, বিদ্যা-অর্জনে, বুদ্ধির আলোচনায়, লোকহিতে, শিল্পসাহিত্য-সৃষ্টিতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে। সেদিকে যদি আমাদের দেশে অভাব থাকে তবে নিজের হাত দুটোকে মনোবিহীন কল-আকারে পরিণত করে আমরা যতই সুতো কাটি আর কাপড় বুনি আমাদের লজ্জা যাবে না, আমরা স্বরাজ পাব না।

আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারম্বার বলেছি, যে-কাজ নিজে করতে পারি সে-কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে। আপন পক্ষের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে আছি বলেই অপর পক্ষের কথা নিয়ে এত অত্যন্ত অধিক করে আমরা আলোচনা করে থাকি। তাতে শক্তিহ্রাস হয়। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই। সে পরিচয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত। দেশের সেবার মধ্যে দেশের প্রতি প্রীতির প্রকাশ কোনো বাহ্য অবস্থান্তরের অপেক্ষা করে না, তার নির্ভর একমাত্র আন্তরিক সত্যের প্রতি। আজ যদি দেখি সেই প্রকাশ অলস উদাসীন, তবে বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ পেলেই অন্তরের সেই জড়তা দূর হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। আগে আমাদের বাহিরের বাধা দূর হবে, তার পরে আমাদের দেশপ্রীতি অন্তরের বাধা ভেদ করে পরিপূর্ণ শক্তিতে দেশের সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন আত্মবিড়ম্বনার কথা আমরা যেন না বলি। যে মানুষ বলে আগে ফাউন্টেন পেন পাব, তার পরে মহাকাব্য লিখব, বুঝতে হবে তার লোভ ফাউন্টেন-পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়।

যে দেশাত্মবোধী বলে, আগে স্বরাজ পেলে তার পরে স্বদেশের কাজ করব, তার লোভ পতাকা-ওড়ানো উর্দি-পরা স্বরাজের রঙকরা কাঠামোটার 'পরেই। একজন অর্টিস্‌ট্‌কে জানি, তিনি অনেক দিন থেকে বলে এসেছিলেন, রীতিমতো স্টুডিয়ো আমার অধিকারে না পেলে আমি হাতের কাজ দেখাতে পারব না। তাঁর স্টুডিয়ো জুটল, কিন্তু হাতের কাজ আজও এগোয় না। যতদিন স্টুডিয়ো ছিল না ততদিন ভাগ্যকে ও অন্য সকলকে কৃপণ বলে দোষ দেবার সুযোগ তাঁর ছিল, স্টুডিয়ো পাবার পর থেকে তাঁর হাতও চলে না মুখও চলে না। স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথাও তেমনিই সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।

(বানান অপরিবর্তিত)

M/S. KANAK ENTERPRISE

Civil Contractor & General Order Suppliers.
GSTIN No. 19AYTPD7885M1Z9

Mob: 9734426610/ 8918840971

Address
Vill + P.O– Chaitanyapur
P.S– Sutahata, Purba Medinipur
PIN– 721645
Mob: 9734426610/ 8918840971
E-mail: bidhandhara2@gmail.com

‘অস্তিত্ব’ প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

১। অস্তিত্বঃ প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ)	১৫০.০০
২। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ এক	২০০.০০
৩। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ দুই	২০০.০০
৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং...	১৩০.০০
৫। জীবন দিশারী ‘অস্তিত্ব’	৩০.০০
৬। মেধা প্রতিভা কি ভাগ্য (!) বাচক? কী তার লভ্য প্রযুক্তি?	১৫০.০০
৭। দাম্পত্য প্রযৌক্তিক পরিবার সমিতি	৩০.০০
৮। বস্তু প্রযুক্তি নির্মাণী ‘অস্তিত্ব’	২৫.০০
৯। সত্তার অর্গল ভাঙাটাই মনের দরজা খোলার রহস্য	৪০.০০
১০। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ	১০০.০০

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)
যোগাযোগ: ৯৮৩০০৬৯৫২৫
E-mail: emdadul197@gmail.com

শিক্ষায়ণ মিশন

পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানেঃ- মোঃ হায়দার আলি

Reg. No.– S/2L/56343 of 2016-17

আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত– ২০১৪

স্থানঃ- ডিহিপাড়া হাইস্কুল মোড়, আষাড়িয়াদহ, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৪৮.

এখানে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক/ শিক্ষিকা দ্বারা যত্ন সহকারে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি অবধি পড়ানো হয়।

যোগাযোগ নং- ৯৬৩৫৪৩৫৬৯৯/ ৯৯৩৩১২০৬৫২

Issue date 28 July 2021.
Vol. III, Issue 2 Voice Mark

সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব ও রাজনৈতিক দিশাহীনতায় আর্থসমাজ অস্থির। তার লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্যর্থ। এই সংকটাপন্ন পটভূমিতে শান্তি লক্ষ্যে – ১। অস্তিত্ব: প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ) ১৫০. ২। মানুষ: দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... (বর্তন ক্রম: এক) ২০০. ৩। মানুষ: দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... (বর্তন ক্রম: দুই) ২০০. ৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং ... ১২০. ৫। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ ১০০.

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)

Published by Md. Azad Hossain from Bhagwanpur, Ashariadaha, Lalgola, Murshidabad, Pin-742148 and printed by him at M/s. KIS Offset Press, Berhampore, Murshidabad, Pin-742101.